সুচিত্রা ভট্টাচার্য

হাসি মজা উল্টো রঙ্গ

হাসি মজা ডট কম।

নামেই বিলক্ষণ বোঝা যায়, 'ডট কম' যুগের ছোটদের জন্যে সাজানো হাসি আর মজার রোশনাই।

ভুলের মাশুল, সমাজসেবা মাইকি জয়, স্মৃতিধরের বিস্মৃতি থেকে বিপিনবিহারীর বিপদ, ছোট্ট ভুল, মহাবিদ্যা হয়ে চোরের উপর বাটপাড়ি...এইরকম একডজন গপ্পো।

বিশিষ্ট কথাশিল্পীর ফুটন্ত কলমে অফুরন্ত আনন্দ। রামগরুড়ের ছানারাও ফিক্ করে হেসে ফেলবে।

হাসি মজা উদ্দেশ্য

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

হাসি মজা উল্টো রঙ্গ

পত্র ভারতী

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১১

HASI MAJA DOT COM
by
Suchitra Bhattacharya

ISBN 978-81-8374-102-6

প্রচ্ছদ রোচিষ্ণু সান্যাল

অলংকরণ অঞ্জন সেনগুপ্ত

মূল্য
১২০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com
website : bookspatrabharati.com
Price Rs. 120.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

ভুলের মাশুল ৯

সমাজসেবা মাইকি জয় ২১

স্মৃতিধরের বিস্মৃতি ৪১

বার্বেলিয়া ৫৩

কাকতালীয় ৭৯

সরল স্মৃতিধর ৯১

বিপিনবিহারীর বিপদ ১০৩

ছোট্ট ভুল ১১৭

মহাবিদ্যা ১২৯

আজব ভুল ১৪৩

দৌড়বীর ১৫৩

চোরের উপর বাটপারি ১৬৩

ভুলের মাশুল

ভরদুপুরে বাড়ি ফিরছিলেন নন্দদুলাল। স্কুল থেকে হাফ ছুটি নিয়ে পড়িমড়ি দৌড়চ্ছেন। কী যেন একটা জরুরি কাজ আছে বাড়িতে। কিন্তু কাজটা যে কী, এই মুহূর্তে মনে করতে পারছেন না কিছুতেই।

ইদানীং এই এক ফ্যাসাদ হয়েছে। নন্দদুলালের স্মৃতিশক্তি বড় বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করছে আজকাল। এমনিতেই আলাভোলা বলে বরাবরই একটা অখ্যাতি আছে তাঁর। সেভেনের অ্যালজেব্রা ক্লাসে বেমালুম টেনের জিওমেট্রির কঠিন কঠিন এক্সট্রা কষাতেন, চাল আনতে বললে চালতা আনতেন বাজার থেকে কিংবা তেঁতুলের বদলে তেজপাতা। তবে সম্প্রতি বিস্মরণের অসুখটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে পরিচিতদের চিনতে পারেন না, অপরিচিতদের চেনা ভেবে দিব্যি ডেকে গল্প করেন। নিজের ছেলেমেয়েদের নাম পর্যন্ত গুলিয়ে ফেলছেন হরদম। এই তো সেদিন দই-মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি রওনা দিয়ে ছেলের কলেজের হস্টেলে হাজির। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ অত

খাবারদাবারের বহর দেখে ছেলে তো হাঁ। গত পরশু তো আরও কেলেঙ্কারি। জামাই ফোনে বারবার বলছে, 'বাবা আমি বিনয়...।' কিন্তু বিনয়টি যে কে কিছুতেই ঠাহর করে উঠতে পারলেন না নন্দদুলাল। শুনে গিন্নির সে কী হাউমাউ, 'ছি ছি, জামাইকে আমি মুখ দেখাব কী করে!"

তা মনে না পড়লে কী করবেন নন্দদুলাল? কী-ই বা করতে পারেন? আজও তো কত কষ্ট করে দরকারি কাজটাকে গেঁথে রেখেছিলেন মগজে, স্কুলেও বারকতক ঝালিয়ে নিয়েছেন, অথচ ফ্ল্যাটবাড়ির গেটে পৌঁছোনোর আগেই মস্তিষ্ক বেবাক ফরসা।

চৈত্র মাস। ঠাঠা রোদ্দুর। রাস্তায় জনমনিষ্যি নেই। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে নন্দদুলাল ঝুম দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ। আর একবার খোঁচালেন মগজটাকে। গিন্নি আজ বাপের বাড়ি গেছেন, ফ্ল্যাট পাহারা দেওয়ার কথা ছিল কি? উঁহু, অন্য কিছু। অন্য কোনও কাজ।

গোল্লায় যাওয়া স্মৃতিশক্তিটাকে মনে মনে গাল পাড়তে পাড়তে গেট ঠেলে কম্পাউন্ডে ঢুকলেন নন্দদুলাল। কপালে ইয়া মোটা মোটা ভাঁজ ফেলে সিঁড়ি ভাঙছেন। চারতলায় পা রেখেই থমকে গেলেন আচমকা। তাঁদের ফ্ল্যাটের দরজায় কে ও?

বছর পঁচিশেকের এক যুবক ঝুঁকে কী যেন করছিল দরজায়।

লিকলিকে রোগা, মধুকুলকুলি আমের মতো মুখ, পরনে কুচকুচে কালো ফুলপ্যান্ট, ক্যাটকেটে সবুজ টিশার্ট। হাতে নানা মাপের স্ক্রু-ড্রাইভার।

মানুষের সাড়া পেয়ে চমকে ফিরল ছেলেটা। হাত পিছনে করে যন্ত্রপাতি লুকোচ্ছে।

কীমাশ্চর্যম! সঙ্গে সঙ্গে নন্দদুলালেরও মনে পড়ে গেল আজ টিভির মেকানিক আসার কথা ছিল বটে। পাছে লোকটা ফিরে যায়; তাই তাঁকে একটু চটপট আসতে বলেছিলেন গিন্নি।

নন্দদুলালের মুখে হাসি উপচে পড়ল, 'ও, তুমি তা হলে এসে গেছ?'

ছেলেটা কেমন যেন সিঁটিয়ে গেছে। আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ...না...মানে...'

'মানে আমি বুঝি গেছি। কেউ নেই দেখে নিজেই দরজা খুলে ঢুকে পড়ছিলে!' নন্দদুলালের স্বরে শিক্ষকের সুর, 'তোমরা, এখনকার ছেলেরা কী বলো তো? একটু অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই?'

ছেলেটা অধোবদন। ঢোক গিলছে, 'অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। এবারকার মতো মাপ করে দিন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এরকমটা আর কোনও বাড়িতে গিয়ে কোরো না। স্ক্রুডাইভার দিয়ে খোঁচালে দরজার লক নষ্ট হয়ে যায়।' বলেই পকেট থেকে চাবি বের করে দিলেন

নন্দদুলাল, 'নাও খোলো।'

ছেলেটা চাবিতে মোটেই উৎসাহী নয়, তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। হঠাৎই সুড়ুত করে ধাঁ মারার চেষ্টা করল। ওমনিই নন্দদুলাল খপ করে তার কবজি চেপে ধরেছেন। কড়া গলায় বললেন, 'কাজ না সেরে কেটে পড়ছ যে বড়?'

'আজকের মতো ছেড়ে দিন স্যার,' ছেলেটার মুখ কাঁদোকাঁদো, 'দয়া করুন স্যার।'

'সিন ক্রিয়েট করছ কেন? এসেই যখন পড়েছ, কাজটা সেরেই যাও না। দরজা থেকে চলে গেলে তোমার মাসিমাকে আমি কী কৈফিয়ত দেব?'

'আ-আ-আমার মাসিমা?'

'হ্যাঁ। আমার গিন্নি। তোমার জন্যই তো তিনি আমায় চটপট আসতে বলেছিলেন। বলতে বলতে নন্দদুলাল চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলেছেন। টানলেন ছেলেটাকে, 'এসো, ভেতরে এসো!'

ফ্ল্যাটে ঢুকেও ছেলেটা জড়সড় দাঁড়িয়ে। সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়ে নন্দদুলাল বললেন, 'কী হল, বোসো!'

'বো-বো-বো-বোসব?'

'অবশ্যই। যত নগণ্য কাজেই তুমি আসো না কেন, তুমি এখন আমার অতিথি। আর অতিথির সমাদর করা গৃহস্বামীর কর্তব্য।'

কী বুঝল কে জানে, ছেলেটা হাঁটু কেতরে বসল সোফায়।

পিটপিট চোখ চালাচ্ছে ফ্ল্যাটময়।

নন্দদুলাল গলা ঝাড়লেন, 'এবার তোমার সঙ্গে ভালো করে আলাপ-পরিচয়টা সেরে ফেলা যাক। নাম কী তোমার?'

'আজ্ঞে, ননী। ননীগোপাল।'

'বাহ্, তুমি আমি তো তা হলে একই হে। ননীগোপালও যিনি, নন্দদুলালও তিনি। ঠিক কি না?'

'কী যে বলেন স্যার?' ননীগোপাল বেজায় লজ্জা পেয়েছে। গা মুচড়ে বলল, 'কোথায় আপনি, আর কোথায় আমি!'

'নিজেকে কখনও ছোট ভাবতে নেই ননীগোপাল। দুনিয়ায় কোনও কাজই হেলাফেলার নয়। তুমিও পরিশ্রম করে খাও, আমিও খেটে খাই। তফাত এইটুকুই, আমার হাতে থাকে চক-ডাস্টার, আর তোমার হাতে স্ক্রুডাইভার। তা যে পেশায় যা লাগে।'

'বাঃ, বেড়ে বলেছেন তো,' এতক্ষণে ননীগোপাল যেন অনেকটাই সপ্রতিভ, 'সত্যিই তো, খেটেখুটেই তো খাই।'

'গুড। কথাটা মাথায় রাখবে।' নন্দদুলাল নড়েচড়ে বসলেন, 'তা ক'দ্দিন আছ এই লাইনে?'

'আজ্ঞে, প্রায় বছরপাঁচেক।'

'হাত মোটামুটি পাকা তো?'

ননীগোপাল ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, 'প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ পেলাম কই স্যার?'

'বটে? দাও প্রমাণ। দেখাও তোমার কেরামতি।'

তেমন একটা হেলদোল দেখা গেল না ননীগোপালের। বসে আছে গ্যাঁট হয়ে।

নন্দদুলাল তাড়া লাগালেন, 'কী হল? শুরু করে দাও।'

'পারব না স্যার। সামনে কেউ থাকলে আমার হাত চলে না।'

'অ। তার মানে আমাকে ওঘরে চলে যেতে হবে?...তা বেশ। একা-একাই করো না হয়। তার আগে দুজনেই তেতে-পুড়ে এসেছি, চলো একটু জলটল খেয়ে নিই। শরবত চলবে?'

'তা একটু হলে মন্দ হয় না। গলাটা বড্ড শুকনো মেরে গেছে।'

'আহাহা। জলজিরা খাবে? না আমের সিরাপ?'

'গরিব মানুষের অত বাছাবাছি করলে কি চলে স্যার? দিন যা হোক।'

ননীগোপালের লাজুক লাজুক ভাব, কথা বলার ধরন বেশ উপভোগ করছিলেন নন্দদুলাল। খুশি খুশি মুখে বললেন, 'তা হলে এক কাজ করো। উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে আমের সিরাপটাই বের করো। সঙ্গে ঠান্ডা জলের বোতল। রান্নাঘরে কাচের গ্লাস আছে, পরিমাণমতো মিশিয়ে নিজেই বানিয়ে ফ্যালো তো দেখি। আর হ্যাঁ, যদি মানে না লাগে, আমাকেও এক গ্লাস দাও।'

'এ কী বলছেন স্যার? আপনার সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি,

এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

লাফিয়ে সোফা ছেড়ে বেড়ালপায়ে ফ্রিজের কাছে গেল ননীগোপাল। গ্লাস, জল, সিরাপ ঠিকঠাক খুঁজে নিয়ে দু-গ্লাস শরবত নিমেষে প্রস্তুত। একটা গ্লাস নন্দদুলালকে ধরিয়ে দিয়ে গদগদ মুখে বলল, 'আপনার মতো মানুষ আমি দুটো দেখিনি স্যার। লোকে আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহারটাই না করে! আর আপনি কিনা এই দীনহীনকে তরিযুত করে শরবত খাওয়াচ্ছেন?'

'আমার চোখে সব মানুষই সমান ননী।' গর্বিত মুখে গ্লাসে চুমুক দিয়ে নাক কুঁচকোলেন নন্দদুলাল, 'অ্যাহ্, শরবত ঠান্ডা জলে বানাওনি?'

'জল শীতল হয়নি স্যার। ফ্রিজ বন্ধ।'

'বাহ্, তুমি তো বেশ শুদ্ধ ভাষা বলো! পড়াশুনো ক'দ্দুর করেছ?'

'আজ্ঞে, ক্লাস এইট।'

'ছেড়ে দিলে কেন?'

'অভাবের তাড়নায় স্যার। জঠর-জ্বালা মোক্ষম জ্বালা।'

'তা অবশ্য ঠিক,' নন্দদুলাল মাথা দোলালেন, 'তো শুধু এই কাজই জানো? নাকি অন্য কিছুও শিখেছ?'

পিচিক করে একচিলতে হাসি পিছলে গেল ননীগোপালের ঠোঁটে, 'আজ্ঞে, সূক্ষ্ম কাজও কিছু কিছু জানা আছে স্যার।'

'কীরকম?'

'পামিং, পাসিং!...ধরুন, যে-কোনও জিনিস মুঠোয় নিলাম, দু-বার শূন্যে হাত ঘোরাব, ব্যাস জিনিসটা ভ্যানিশ।'

'বলো কী হে? ম্যাজিকও জানো?'

'যে যে নামে ডাকে। কেউ বলে ম্যাজিক, কেউ বলে হাতসাফাই,' অম্লানবদনে বলল ননীগোপাল, 'আমার গুরু বলেন, এসব কাজে আমি নাকি তাঁকেও টেক্কা দিয়েছি।'

'তা হলে তো একবার দেখতে হয়।'

'দেখাতেই পারি। কী সরাব বলুন?'

গ্লাস থেকে চামচখানা তুলে এগিয়ে দিলেন নন্দদুলাল, 'এটাকে হাওয়া করো দেখি।'

বাঁ হাতের চেটোয় চামচ রাখল নন্দীগোপাল। ডান তালু দিয়ে চাপা দিল বাঁ হাত। তারপর দুটো হাত একসঙ্গে করে শূন্যে ঝাঁকাল খানিক। হঠাৎ ঝাং করে দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে দিয়েছে, 'দেখুন স্যার, চামচ নেই।'

নন্দদুলাল শিশুর মতো উল্লসিত, 'তাই তো! তাই তো! আর কী ভ্যানিশ করতে পারো? একটা থালা এনে দেব?'

'অতো বড় জিনিসে অসুবিধে আছে স্যার। বললাম না, এ অতি সূক্ষ্ম কাজ। জিনিসটা ছোটখাটো হবে, দামি হবে, তবেই না হাত চলবে।'

'ছোট, অথচ দামি জিনিস?' নন্দদুলাল ভাবনায় পড়ে গেলেন, 'কীরকম বলো তো?'

'এই ধরুন গিয়ে মাসিমার কানের দুলটুল। হারটার। কিংবা আংটিটাংটি।'

আঙুল থেকে সোনার আংটিটা খুলে দিলেন নন্দদুলাল। মুঠোয় চেপে মাত্র দু-বার ফুঁ দিল ননীগোপাল, মুঠো খুলতেই আংটি উধাও। উৎসাহিত হয়ে ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার থেকে গিন্নির মুক্তোর দুলজোড়া এনে দিলেন, কয়েক সেকেন্ডে দুল অদৃশ্য। উত্তরোত্তর চমৎকৃত হচ্ছেন নন্দদুলাল। আলমারি খুলে বের করে আনলেন সোনার বোতাম, সোনার চেন, রুপোর খুদে সিঁদুরকৌটো। নিমেষে মিলিয়ে গেল সব। আস্ত একখানা সোনার বালাও যখন কর্পূরের মতো উবে গেল, নন্দদুলালের চোখ তখন ঠিকরে বেরোয় আর কী!

আপ্লুত স্বরে নন্দদুলাল বললেন, 'তুমি তো আইনস্টাইনকেও ঘোল খাওয়ালে হে ননী। মাসকে তুমি এনার্জিতে পরিণত না করেই নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছ?'

'আইনস্টাইন?' ননীগোপাল চোখ কুঁচকোল, 'তিনি কে? আমাদের লাইনের কেউ?'

'তিনি একজন মহান বিজ্ঞানী।...তবে তুমিও লা-জবাব। তোমারও তুলনা নেই।'

'আপনি মহান বলে কদর দিলেন স্যার।'

'হুম। তা এবারে জিনিসগুলো ফেরত এনে দাও।'

'অপরাধ নেবেন না স্যার,' ননীগোপাল ফিচেল হেসে ফেলল, 'অর্ধেক বিদ্যা সবে আয়ত্ত করেছি স্যার। বাকি অর্ধেক,

মানে ফেরত আনা, এখনও শেখা হয়নি।'

'এ তো ভালো কথা নয়,' নন্দদুলাল অসন্তুষ্ট হলেন, 'কোনও কিছু শিখতে হলে পুরোপুরি শিখবে। আধাখ্যাঁচড়া জ্ঞান নিয়ে চক্রব্যূহে অভিমন্যুকে মরতে হয়েছিল, সে খবর রাখো? পরের বার যেন এমন অজুহাত না শুনি, বুঝলে?'

'যে আজ্ঞে স্যার', ননীগোপাল হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল, 'আজ তা হলে আসি?'

'সে কী? এখনও তো আসল কাজে হাতই দাওনি! বললে একা বসে করবে, আর জিনিসে হাত না ছুঁইয়েই পালাচ্ছ?' নন্দদুলাল ধমকে উঠলেন, 'আমি ওঘরে গিয়ে শুচ্ছি, তুমি ততক্ষণে টিভিটার গতি করে ফ্যালো।'

'এই টিভিটার?'

'হ্যাঁ। দামি রঙিন টিভি, সাবধানে হ্যান্ডেল কোরো। আর দেখো, গোটা ঘরে স্ক্রু-টু ছড়িয়ে রেখো না, তোমার মাসিমা রাগ করবেন।'

আবার চোখ পিটপিট করছে ননীগোপাল। ঘাড় চুলকোচ্ছে। আচমকা শুঁটকো চোয়ালে কান-এঁটো করা হাসি, 'খোলাখুলির ঝামেলা না করে টিভিটা যদি নিয়েই যাই স্যার?'

'নিয়ে গিয়ে মেরামত করবে? উত্তম প্রস্তাব।...কিন্তু কাঁধে করে ধাড়ি জিনিসটিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

'একটা রিকশা ডাকব স্যার?'

'গুড আইডিয়া। তবে রিকশা ভাড়াটাও তো তোমাকে

আমার দিয়ে দেওয়া উচিত।' ফস করে মানিব্যাগ থেকে একখানা একশো টাকার নোট বের করলেন নন্দদুলাল, 'এটা রাখো। ডেলিভারি দেওয়ার সময়ে তোমার মাসিমার সঙ্গে হিসেবটা প্লাস-মাইনাস করে নিও।'

রিকশায় টিভি চাপিয়ে ননীগোপাল বিদায় নেওয়ার পর আধ ঘণ্টাও কাটেনি, দরজায় বেল। নন্দদুলালের গিন্নি ফিরে এসেছেন বাপের বাড়ি থেকে। সঙ্গে মোটাসোটা চেহারার এক বছর তিরিশেকের লোক।

অবাক মুখে নন্দদুলাল বললেন, 'তুমি? এত তাড়াতাড়ি?'

'তোমার ওপর ভরসা করে সুস্থির থাকা যায়? কোনওরকমে নাকেমুখে গুঁজেই বেরিয়ে পড়েছি।' নন্দদুলালগিন্নি ঘাম মুছছেন, 'পাড়ায় ঢুকে দেখি ইনি দোকানে গালে হাত দিয়ে বসে। তুমি নাকি ওঁর ছায়াও মাড়াওনি।'

'উনি কে?'

'ফ্রিজ মেকানিক। পইপই করে তোমায় বলে যাইনি, স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এঁকে ধরে আনবে? এই গরমে ফ্রিজ খারাপ থাকলে কতটা অসুবিধে হয় সে হুঁশ তোমার আছে?'

নন্দদুলালের মাথায় হাত। এহ্, ভুলটা এবার বেশি মারাত্মক হয়ে গেছে।

সমাজসেবা মাইকি জয়

অফিস ছুটির পর ফাইলপত্র গুছিয়ে উঠব উঠব করছিলেন বিপুল সেনাপতি, এমন সময়ে টেবিলের সামনে কালোবরণের আবির্ভাব,—'স্যার, একটা কথা ছিল যে।'

'বলে ফ্যালো।'

'আপনাকে পশ্‌শুদিন এক জায়গায় যেতে হবে।'

'আমাকে? কোথায়?'

'আমাদের পাড়ায়। ক্লাব থেকে আমরা একটা সমাজসেবার আয়োজন করেছি। আপনাকে পোধান অতিথি হতে হবে।'

শব্দের র-ফলা কদাচিৎ ব্যবহার করে কালোবরণ, কানে খচ্‌খচ্‌ বাজে। তবু মনে মনে বেশ পুলকিতই হলেন বিপুলবাবু। পেশায় খুদে অফিসার হলেও সাহিত্য জগতে ইদানীং বেশ নাম হয়েছে তাঁর। লেখকদের আড্ডায় মাঝে মাঝে ডাক পড়ে, ছোটখাটো সাহিত্যসভায় স্বরচিত গল্পও পাঠ করেছেন বারকয়েক। পাঠক মহলে তিনি এখনও তেমন দুর্দান্ত জনপ্রিয় নন বটে, তবে মোটামুটি তাঁর নাম এখন জানে অনেকে। অবশ্য এমন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ তাঁর জীবনে এই প্রথম।

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কাছাখোলা হয়ে রাজি হয়ে গেলেন না বিপুলবাবু। এতে দর কমে যায়। কালোবরণও তাঁকে হ্যাংলা ভাবতে পারে।

কপালে চিন্তার ভাঁজ ফুটিয়ে বিপুলবাবু বলেন, 'পরশুদিন মানে, রোববার? ওই দিন একটু লেখালিখি নিয়ে বসব ভাবছিলাম।'

'সরস্বতীর সাধনা তো জীবনভর করতে পারবেন স্যার। এমন পোগ্রাম আর দুটি পাবেন না।'

'কী কী প্রোগ্রাম হবে?'

'গেলেই দেখতে পাবেন, আগে থেকে ভাঙব কেন?'

বিপুলবাবুর সামান্য অস্বস্তি হল। বক্তৃতা-টক্তৃতা দিতে তিনি পিছপা নন, কিন্তু অনুষ্ঠানের ধরন জানতে পারলে স্পিচটা ভালো করে তৈরি করে নিয়ে যাওয়া যায়। থাক গে, চটজলদি মুখে মুখেই নয় কিছু বানিয়ে ফেলবেন।

কালোবরণ হাসি হাসি মুখে বলল, 'কোনও ওজর আপত্তি শুনছি না স্যার। যেতে আপনাকে হবেই। আমি বড় মুখ করে সকলকে বলেছি, একখানা সাহিত্যিক ধরে আনব। পল্টু গতবার একটা ফুটবল প্লেয়ার এনেছিল। ঝন্টু সাহা। মোহনবাগানের ব্যাকে খেলে। আমি এবার সাহিত্যিক হাজির করে ডাঁট ভেঙে দেব।'

'খেলোয়াড়ের জায়গায় সাহিত্যিক? তোদের চলবে তো?'

'চলবে মানে? দৌড়বে। সাহিত্যিকরা খেলোয়াড়ের চেয়ে কম কীসে? তারা বল ছোটায়, আপনারা কলম ছোটান। আর আপনি তো সাক্ষাৎ সরস্বতীর বরপুত্র।'

টিংটিঙে রোগা বিপুল সেনাপতির বাইশ ইঞ্চি বুকের ছাতি বেলুনের মতো ফুলে উঠল। কালোবরণের ওপর একটু একটু শ্রদ্ধা জাগছে। এই অফিসের পিওন কালোবরণ পাড়ুই অতি সার্থকনামা ছেলে। গায়ের রং মিশমিশে কালো। অফিসে অনেকেই তামাশা করে বলে কালোবরণের ঘাম কলমে ভরে নিলে তা দিয়ে নাকি দিব্যি লেখা যায়। কথাও একটু বেশিই বলে কালোবরণ। কাজে-কর্মেও তেমন মন নেই। সারাদিন উড়ু উড়ু মেজাজে এ দপ্তর ও দপ্তর চরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু একটা গুণ তো আছে, ছোকরা গুণীর মর্যাদা বোঝে।

খুশি খুশি মুখে বিপুলবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। অত করে যখন বলছিস, যাব'খন। তা আর কে কে আসছে?'

'সে লম্বা লিস্ট। ডাক্তার, পুলিশ, সাংবাদিক...তবে আপনি সবার মাথায়। পোধান অতিথি বলে কথা।'

'প্রেসিডেন্ট কে হচ্ছেন?'

'অমরজীবন মজুমদার। আমাদের পাড়ার সব চেয়ে পোবিন্ মানুষ। গত বছর তাঁর শতবার্ষিকী হল। দেখবেন, একশো-এক বছর বয়সেও তাঁর সমাজসেবায় কী উৎসাহ!'

'বেশ বেশ।...কখন যেতে হবে?'

'সকাল ন'টায়। আমিই আপনাকে গিয়ে নিয়ে আসব। বাড়ি থেকে।'

হাওয়ায় ফুরফুর ভেসে ভেসে বাড়ি ফিরলেন বিপুলবাবু। বিপুলের স্ত্রী তটিনী দেবী সর্বদাই সাহিত্যিক স্বামীর গৌরবে ডগমগ থাকেন, তিনি তো শুনে মহা আহ্লাদিত, 'এই শুরু হল, বুঝলে! এবার দ্যাখো না কত জায়গা থেকে তোমার ডাক আসে। দেশ এবার তোমায় চিনতে পারবে।'

'বলছ?' আগামী দিনের কথা ভেবে বিপুলবাবুর গায়ের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বলছি। সঙ্গে সঙ্গে এও বলছি, প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা ভাষণ লিখে রাখো। দুর্গাপুজো, কালীপুজো সরস্বতীপুজো, শীতলাপুজো, কার্তিকপুজো, গণেশপুজো, রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, স্কুলের পুরস্কার বিতরণী, হরিসভা...

তটিনী ফিরিস্তি দিয়েই চলেছেন। বিপুলবাবু অধৈর্যভাবে বললেন, 'সে নয় রেডি রাখা যাবে। এখন বলো তো দেখি, পরশুদিন কী পরে যাওয়া যায়?'

'ধুতি আর সিল্‌কের পাঞ্জাবি।'

'আমার আবার সিল্‌কের পাঞ্জাবি কোথায়? সবই তো আদ্দির।'

'বাঃ রে। তোমার বাবারটা আলমারিতে পড়ে আছে না?'

'ওটা কি আমার গায়ে হবে? বাবা কত লম্বা-চওড়া ছিলেন।'

'তা হোক। নয় একটু ঢলঢলই করবে। সিল্‌কের পাঞ্জাবি ছাড়া প্রধান অতিথি মানায়?'

'বটেই তো। তবু...'

'নো তবু। আমি যা বলছি তাই হবে। আজই আমি ওটা বার করে ইস্ত্রি করিয়ে রাখছি। চন্দনকাঠের বোতাম লাগিয়ে দেব, দেখবে কী ভুরভুর গন্ধ ছাড়বে।'

বারো বছরের মিলি হাঁ করে বাবা-মার কথা গিলছিল। কথা শেষ হল কি হল না, তিড়িং-বিড়িং লাফাতে লাফাতে ছুটেছে বন্ধুদের কাছে। বাবার খবরটা এক্ষুনি শোনাবে সকলকে। তটিনীও আর দাঁড়ালেন না। এত বড় সংবাদটা এখনই প্রতিবেশীদের না জানালে তাঁরও যে পেটের ভাত হজম হবে না। শুনতে শুনতে পাড়ার লোক ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে মরবে, তবেই না সুখ!

রবিবার সকাল। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় দরজায় ভ্যাঁ-পোঁ-ভ্যাঁ-পোঁ। প্রতিবেশীদের উঁকি-ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে বীরদর্পে গাড়িতে উঠলেন বিপুল সেনাপতি।

ড্রাইভারের সঙ্গে একাই এসেছে কালোবরণ। গাড়ি ছুটতেই তারও মুখ ছোটা শুরু হল, 'গোড়াতেই আপনাকে একটা কথা বলে রাখি স্যার। ওখানে গিয়ে কিন্তু কারুর সঙ্গে বেশি বাতচিৎ

করবেন না।'

বিপুলবাবু ঈষৎ অবাক, 'কেন বলো তো?'

'বাঃ রে! আপনি এখন ভি আই পি না? যার-তার সঙ্গে কথা বলবেন কেন? আপনি আপনার গ্যাবিটি নিয়ে থাকবেন।'

আবার একটা র-ফলা বাদ। যাক গে। বিপুলবাবু মনে মনে ক্ষমা করে দিলেন কালোবরণকে। বললেন, 'সে তো বটেই। সে তো বটেই।'

'আর হ্যাঁ, যেটুকু করতে বলা হবে, সেইটুকুই করবেন। তার বেশিও নয়, কমও নয়।'

'মানে?'

'মানেটা তাহলে খুলেই বলি স্যার। আমাদের একতা সঙেঘর দুটো দল আছে। একদল এবার চেয়েছিল গানের শিল্পী আনতে, আমরা তাতে ব্যাগড়া দিয়েছি। বলেছি, একটা সাহিত্যিক আনলে একতা সঙেঘর অনেক পেস্টিজ বাড়বে। এখন ওরা জোট পাকাচ্ছে কী করে আমাদের বেইজ্জৎ করা যায়। তাই বলছিলাম আর কী...'

একতা সঙেঘর দলাদলি! বিপুলবাবু প্রমাদ গুনলেন। শেষ পর্যন্ত কোনও ফ্যাসাদে পড়তে হবে না তো? কালোবরণের বিপক্ষে যদি কোনও ষণ্ডাগুণ্ডা থাকে...'

গলি ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়েই হঠাৎ তীর বেগে ছুটেছে

গাড়ি। রাস্তায় আজ তেমন ভিড় নেই বটে, তবে ভারী বিপজ্জনকভাবে লোকজনকে পাশ কাটাচ্ছে ড্রাইভার। প্রবল বেগে একবার মোড় ঘুরল, রেরে শব্দ উঠল রাস্তায়।

আতঙ্কে কালোবরণের হাত খামচে ধরলেন বিপুলবাবু, 'ভাই কালো, ওকে একটু আস্তে চালাতে বলা যায় না?'

একতা সঙেঘর ঝগড়া-বিবাদের কথা ভুলে কালোবরণ হাহা করে হেসে উঠল, 'জটাদা স্লো চালাতে পারে না স্যার। আশির কম স্পিড হলেই জটাদা স্টিয়ারিং-এ ঘুমিয়ে পড়ে।'

'সব্বোনাশ! অ্যাক্সিডেন্ট হবে যে!'

'হবে কী? হয় তো। এই তো গত সপ্তাহে একটা মারুতি গাড়িকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল।'

জটা নামক দাড়িগোঁফ-অলা লোকটা সঙ্গে সঙ্গে স্টিয়ারিং ছেড়ে পিছনে ঘাড় ঘুরিয়েছে। হাসল মৃদু, অভিনন্দন গ্রহণ করার ভঙ্গিতে মাথা নোওয়াল।

বুকটা হিম হয়ে গেল বিপুলবাবুর।

কালোবরণ বুঝি টের পেয়েছে, আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না স্যার, জটাদার গাড়ির প্যাসেঞ্জাররা তেমন একটা মরে না। এই তো সেবার মিনিবাস চালাতে গিয়ে বিজ টপকে পড়ল বাসসুদ্ধু। ক'টা টেঁসেছে? দুটো বুড়ো, আর বাসের হেল্পার। মোট ছিল সাঁইতিশজন, বাকি সবাই দিব্যি হাসপাতালে ঘুরে বাড়ি চলে গেল।'

জটার গম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'আমি কিন্তু হাসপাতালেও যাইনি।'

'তুমি ওস্তাদ লোক, আগেই ডাইভারের গেট খুলে ঝাঁপ কেটেছিলে।'

র-এর অনুপস্থিতি এবার আর বিপুলবাবুর কানেই ঢুকল না। একটা বিড়বিড় ধ্বনি মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'জেনেশুনেও এমন ড্রাইভারকে রাখে কে?'

'রাখে না তো!' কালোবরণের সপ্রতিভ জবাব, 'জটাদা তো এখন বেকার। মধুদের গ্যারেজে গাড়িটা পড়েছিল, জটাদা চালিয়ে নিয়ে চলে এল।'

বিপুলবাবু চোখ বুজে ফেললেন। ইষ্টনাম জপ করছেন। ভালোয় ভালোয় এখন এ গাড়ি থেকে নামতে পারলে হয়।

গাড়ি অবশ্য মোটামুটি সুস্থ শরীরেই পৌঁছোল। পথে শুধু একটা ঠেলাকে ধাক্কা দিয়ে হঠিয়ে দেওয়া ছাড়া আর তেমন কিছু ঘটনা ঘটেনি।

কালোবরণ হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাল বিপুলবাবুকে। কানে কানে বলল, 'যা বললাম মনে আছে তো স্যার?'

বিপুলবাবুর এখনও ঘোর কাটেনি। কোনওমতে ঘাড় হেলালেন, আছে।

সামনেই খোলা মাঠে ছোটখাটো স্টেজ বাঁধা হয়েছে। পাশে একটা প্যান্ডেলও। স্টেজের ওপর ভয়ানক ব্যস্ত ভঙ্গিতে

ঘোরাফেরা করছে কয়েকটি যুবক, একজন মাইক হাতে হ্যালো হ্যালো করছে। বিপুলবাবুকে মাঠে পাতা চেয়ারে বসিয়ে দিল কালোবরণ। ছেলেটাকে গিয়ে কী বলতেই মাইকে ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে, 'আমাদের প্রধান অতিথি মহান সাহিত্যিক বিপুল সেনাপতি এই মাত্র আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা দলে দলে আসন গ্রহণ করুন, এক্ষুনি আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এক ঝাঁক কুচো-কাঁচা শ্যামাপোকার মতো কোত্থেকে উড়ে এসেছে। ঝপাঝপ্ দখল করে নিল সামনের শতরঞ্চি। বয়স্ক লোকরাও আসছেন একে একে। হেলতে-দুলতে গল্প করতে করতে। মিনিট দশেকের মধ্যেই চেয়ার প্রায় পরিপূর্ণ। দু-একজন এসে যেচে বিপুলবাবুর সঙ্গে আলাপ করে গেল।

ক্রমশ তাজা হয়ে উঠছিলেন বিপুল সেনাপতি। হারানো উদ্যম ফিরে পাচ্ছিলেন। বসেছেন কায়দা করে। মুখে একটা ব্যক্তিত্বমাখানো হাসি ধরে রেখে।

ফের ঘোষণা, 'এইবার আমরা সভাপতি আর প্রধান অতিথিকে বরণ করে অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি। আজকের প্রথম অনুষ্ঠান, স্থানীয় গরিবদের বস্ত্রহরণ। আমদের প্রধান অতিথি সাহিত্যিক বিপুল সেনাপতি নিজের হাতে গরিবদের বস্ত্রহরণ করবেন।'

মৃদু গুঞ্জন উঠেছে একটা। বিপুলবাবুর হাসিটা তুবড়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন এদিক-ওদিকে। কালোবরণকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, 'অ্যাই কালো, কী বলছে এসব? আমি গরিবদের বস্ত্রহরণ করব?'

'করবেনই তো। আপনি নিজের হাতে গরিব-দুঃখীদের বস্ত বিলোবেন।'

'ও।' বিপুলবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে বস্ত্রবিতরণ বলো, বস্ত্রহরণ বলছ কেন?'

'ওই হল।' কালোবরণ কথাটাকে আমলই দিল না, 'ঘণ্টাদা ওরকম একটু ভুলভাল অ্যালাউন্স করে।'

অ্যালাউন্স নয় কালো, অ্যানাউন্স। বলতে গিয়েও বিপুলবাবু থমকে গেলেন। ঘোষক ঘণ্টাদা, কালোবরণদের একতা সঙ্ঘের সম্পাদক, নেমে এসেছে তাঁর কাছে। জোড়হাত করে দাঁড়াল, 'তাহলে আসুন স্যার। আমরা রেডি।'

ঘণ্টার চেহারাটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। একতা সঙ্ঘের সম্পাদক না হয়ে কুস্তিগীরও হতে পারত। তার পিছু পিছু অনুগতের মতো মঞ্চে উঠছিলেন বিপুলবাবু, এক লাঠি ঠকঠক বৃদ্ধকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। পুরো 'দ' হয়ে যাওয়া দেহ, পরনে ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি, সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর। কালোবরণ এসে হাত ধরল বৃদ্ধের, সাহায্য করছে মঞ্চে উঠতে। ইনিই তবে অমরজীবন?

মঞ্চে বসতেই উড়ে আসা মন্তব্য শুনতে পেলেন বিপুলবাবু, 'দুটোই দু-নম্বরি চিজ এনেছে রে। একটা ক্যাংলাকার্তিক, একটা অষ্টাবক্র, এদের কোনও গ্ল্যামার আছে?'

এরাই কি কালোবরণের বিরোধী পক্ষ? ভয়ে ভয়ে বিপুলবাবু নিজের ছোটখাটো শীর্ণ চেহারাটাকে দেখে নিলেন একবার। আন্দাজ করার চেষ্টা করছেন ঝামেলা বাড়লে কোন দিক দিয়ে ছুটে পালানো শ্রেয় হবে। মাঠের সব দিকেই গলি-ঘুঁজি আছে, কোনও একটা দিয়ে যদি বেরিয়ে পড়তে পারেন...

দুটি বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে এসে অমরজীবন আর বিপুলকে পুষ্পস্তবক দিয়ে গেল। কলাবতী পাতার বাঁধনে চারগাছি রজনীগন্ধা, একজোড়া গোলাপ।

পাশে বসা অমরজীবনের মাথা অবিরাম নড়ে চলেছে। মৃদু অস্বস্তি হচ্ছিল বিপুলবাবুর, তবু ভাব জমানোর চেষ্টা করলেন। হাসি মুখে বললেন, 'আপনার নামটি কিন্তু সার্থক। আমার জীবনে দেখা আপনিই প্রথম শতায়ু।'

গোল-গোল চশমা পরা বৃদ্ধের মুখখানা হাসিতে ভরে গেল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেলেপুলেরা আমায় বলেছে। তুমিই তাহলে সেই সাহিত্যিক?'

বিপুলবাবুর ধন্দ লাগল। তাঁর কথাটা কি শুনতে পেলেন না অমরজীবন? লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললেন, সাহিত্যিক মানে...ওই আর কী...একটু-আধটু লিখে থাকি।'

'তাই নাকি? তবে যে ওরা বলল তুমি একটু-আধটু লেখো টেখো?'

'হ্যাঁ, লিখি তো। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ...'

'তাই বলো। আমি ভাবলাম তুমিই লেখো।'

এ যে একেবারে বদ্ধ কালা! বিপুলবাবু মুখ হাসিহাসি রেখেই চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

ঘণ্টা আবার মাইকে এসেছে। গলা ঝেড়ে বলল, 'সভাপতি আর প্রধান অতিথি বরণ শেষ। এবার গরিব দুঃখীরা চুপচাপ লাইনে দাঁড়ান। এক এক করে আসুন, এবং বিপুলবাবুর হাত থেকে বস্ত্র নিয়ে যান।'

তিন-চারজন মুশকো জোওয়ান ইয়া বড় বড় গোটাকয়েক বোঁচকা এনে রাখল স্টেজে। খুলতেই বিপুলবাবুর চক্ষু চড়কগাছ। এ তো সব কম্বল!

ফিসফিস করে ঘণ্টাকে জিগ্যেস করলেন, 'এই বৈশাখ মাসে কম্বল দেবে তোমরা?'

ঘণ্টা ভুরু কুঁচকোল, 'কেন, কম্বল কি বস্ত্র নয়? শীতবস্ত্র।'

'শীতবস্ত্র?'

'ওই হল। এখন পেতে শোবে, ঠান্ডায় গায়ে জড়াবে। ওরা গত বছর ধুতি শাড়ি দিয়েছিল, এগুলো তার থেকে অনেক বেশি ওজনদার।'

একের-পর-এক দরিদ্র মানুষ উঠেছে মঞ্চে। কম্বলগুলো

সত্যিই বেশ ভারী, তুলতে বিপুলবাবুর গলদঘর্ম দশা। একটা করে দিচ্ছেন, আর চটাস চটাস হাততালি পড়ছে। গোটা কুড়ি দেওয়ার পর বিপুলবাবুর জিভ বেরিয়ে গেল। রীতিমতো হাঁপাচ্ছেন। তবু থামার উপায় নেই, অনবরত লোক আসছে। ছিয়াত্তরখানা কম্বল দান করার পর বিপুলবাবু যখন মুক্তি পেলেন, তখন শরীরের সমস্ত শক্তি উবে গেছে। দর্‌দর্‌ ঘামছেন। পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছছেন, ঘাড় গলা মুছছেন।

আবার মাইকে ঘণ্টাধ্বনি, 'আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ। এখন দ্বিতীয় পর্ব। এবার আমাদের এই সুন্দর পাগলাবাবার মাঠটিতে স্বহস্তে বৃক্ষচ্ছেদন করবেন সাহিত্যিক শ্রী বিপুল সেনাপতি।'

বিপুলবাবু স্তম্ভিত। তাঁকে গাছ কাটতে হবে এখন? এও কি সমাজসেবা? এই মাঠে গাছই বা কই? তাহলে কি ঘাস...? ঘাসকে কি বৃক্ষ বলা যায়? বাঁশও তো এক ধরনের ঘাস, তাকে তো বংশবৃক্ষ বলে। কম্বলগুলো নয় একাই বিলিয়েছেন, গোটা মাঠের ঘাস কি তিনি একা হাতে কাটতে পারবেন?

সত্যি সত্যি খুরপি আর নিড়ানি এসে গেছে স্টেজে। ঘণ্টা পিছনে এসে দাঁড়াল। বিপুলবাবু অসহায় চোখে তাকালেন, 'সত্যিই কি আমাকে ঘাস কাটতে হবে? ভাই?'

এত নরম গলায় বিপুলবাবু নিজের ভাইকেও ডাকেননি

কখনও। ঘণ্টা কী গলল? মুখে হাসি দেখা যায় যেন?

ঘণ্টা দাঁত বার করে বলল, 'ছি! ছি! ঘাস কাটা কি আপনার কাজ? ওই যে চারাগাছগুলো রাখা আছে, আপনি ওগুলো পুঁতবেন।'

অর্থাৎ বৃক্ষচ্ছেদন নয়, বৃক্ষরোপণ।

বিপুলবাবুর ধড়ে প্রাণ এল। আরে তাই তো, আগে চোখে পড়েনি মঞ্চের কোণে কয়েকটা চারগাছ রাখা আছে। গোড়ায় মাটি লাগানো। কৃষ্ণচূড়া, আম, নিম, সপ্তপর্ণী,...

বিপুল উৎসাহে বিপুলবাবু খুরপি, নিড়ানি হাতে উঠে পড়লেন। তুমুল জয়ধ্বনির মাঝে নেমে পড়েছেন মঞ্চ থেকে। মাঠের ধারে ধারে জায়গা চিহ্নিত করাই ছিল, একটা একটা করে লাগাচ্ছেন মাটিতে।

গাছ পোঁতা সাঙ্গ হতে ঘণ্টাখানেক লেগে এল। এগারোটা বাজে, ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে চামড়া ঝলসে যাচ্ছে বিপুলবাবুর। তবু ভিড়ের মাঝে মুখে হাসিটাকে ধরে রেখেছেন। হঠাৎ কোত্থেকে আবার কালোবরণের উদয়। হাতে কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল।

তড়বড় করে বলল, 'এটা খেয়ে নিন স্যার, শরীর জুড়োবে।'

বিপুলবাবু ক্লান্ত। জিগ্যেস করলেন, 'কখন ছাড়া পাব কালোবরণ?'

'তাড়া কীসের স্যার? আর একটা পোগ্রাম বাকি, শেষ

হলেই আমি নিজে সশরীরে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

সশরীরে মানে? অশরীরেও পৌঁছে দেওয়া যায় নাকি? কালোবরণের কথার মাত্রায় মোটামুটি অভ্যস্ত বিপুলবাবু টুঁ শব্দটি না করে ফিরলেন মঞ্চে।

ঘণ্টা এবার ঢংঢং বেজে উঠল, 'আমরা এখন অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। যে ভাবে আমাদের একের-পর-এক কাজ সাফল্যমণ্ডিত হল, সে জন্য সাহিত্যিক বিপুল সেনাপতিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই পল্লীবাসীকে, যাঁরা উপস্থিত থেকে আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, একতা সঙ্ঘ এভাবে প্রতি বছরই সমাজসেবার কাজ করে আসছে। আপনারা নিশ্চয়ই এও জানেন, আমরা কথা কম, কাজ বেশি এই নীতিতে বিশ্বাসী। তাই আমরা দুটি কথা নিবেদন করব...'

ঝাড়া চল্লিশ মিনিট বক্তৃতা দিয়ে গেল ঘণ্টা। নিজেদের কর্মতালিকা পেশ করল, আগামী অভিপ্রায় জানাল...। মাঝে মাঝেই কথা হারিয়ে ফেলছে, পকেট থেকে কাগজ বার করে দেখে নিচ্ছে তাড়াতাড়ি। বক্তৃতা যখন থামল, কুচো-কাঁচারা তখন সাফ।

অমরজীবন পাশে ঢুলছেন। বিপুলবাবুরও ঝিমুনি এসে গিয়েছিল, ঘণ্টার ডাকে চট্‌কা ভাঙল, 'এবার যে উঠতে হয় স্যার। শেষ কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ ভাই?'

'বাঃ রে! এতক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী বলছিলাম? আপনি আসার আগে থেকেই তো কাজটা শুরু হয়ে গেছে, এখনও চলছে। এবার আপনাকে সার্টিফিকেটগুলো সই করতে হবে।'

বিপুলবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

ঘণ্টা বিউগল্ হয়ে বেজে উঠল, 'রক্তদান শিবির চলছে স্যার। ওই প্যান্ডেলের ভেতরে।'

বাহ্, এটা তো সত্যিই মহৎ কাজ! রক্তদানের থেকে বড় পুণ্য আর কী আছে? কালোবরণ তাঁকে ধোঁয়ায় রেখেছিল কেন? আশ্চর্য, স্টেথো গলায় ঝুলিয়ে ডাক্তার প্যান্ডেলটায় ঢুকছে, লোকে কবজি চেপে চেপে বেরিয়ে আসছে, অথচ বিপুলবাবু ব্যাপারটা নজরই করেননি! নাহ্, মাথাটা আজ সত্যিই ভোঁতা হয়ে গেছে। গাড়িতে ওই জটাই গুলিয়ে দিয়েছে সব।

সভা প্রায় ফাঁকা। গুটি কয়েক লোক শুধু বসে আছে চেয়ারে, নিজেদের মধ্যে গুলতানি চলছে। ক্লান্তি দূরে ঠেলে তাদের পাশ দিয়ে প্যান্ডেলে ঢুকলেন বিপুলবাবু।

সার সার চারটে ক্যাম্পখাট পাতা রয়েছে প্যান্ডেলে। রক্তদাতা এখন একজনও নেই, খাঁ খাঁ করছে শিবির। চেয়ার, টেবিলে ব্লাড ব্যাংকের লোক গোছগাছ সারছে। একটা ছোট্ট

টেবিলে সার্টিফিকেটের স্তূপ। শূন্য একটা ক্যাম্প-খাটে বসে কাজ শুরু করলেন বিপুলবাবু। ঘণ্টা তাকে বসিয়ে দিয়েই ভোকাট্টা, বিপুলবাবু সার্টিফিকেটে সই করে চলেছেন তো করেই চলেছেন।

হঠাৎই বাইরে কীসের যেন গণ্ডগোল। কালোবরণের গলা না? কার সঙ্গে চেঁচামিচি করছে কালোবরণ? হাতাহাতি মারামারিও চলছে যেন? সর্বনাশ, যা আশঙ্কা করেছিলেন, সেটাই কি ঘটল? উঠে গিয়ে একবার দেখবেন কি বিপুলবাবু?

শিবিরের দরজা অবধি পৌঁছোতে পারলেন না বিপুলবাবু, তার আগেই ইয়া তাগড়াই চেহারার দুটো ছেলে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

একজন কোমরে হাত রেখে বিপুলবাবুর আপাদমস্তক জরিপ করল, অন্য জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এইটাই তো কালোর সাহিত্যিকটা, না?'

তালু শুকিয়ে কাঠ, তবু বিপুলবাবু সাহস হারালেন না। গলায় তেজ এনে বললেন, 'হ্যাঁ, আমিই বিপুল সেনাপতি।'

'কোন যুদ্ধের সেনাপতি, বাপ? গায়ে একখানা আলখাল্লা চাপিয়ে কোন রণক্ষেত্রে আসা হয়েছে?'

কী অপমানকর ভাষা! নয় পাঞ্জাবিটা একটু ঢোলাই হয়েছে বিপুলবাবুর, নয় ঝুল একটু বেশিই লম্বা, নয় তিনি একটু বেশিই রোগা-সোগা, তা বলে এমন মশ্‌করা?

স্বর যথাসম্ভব গম্ভীর রেখে বিপুলবাবু বললেন, 'কে তোমরা? কী চাও?'

'আমরা কালোর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই। আমরা আপনার রক্ত চাই।'

শেষ বাক্যটিতেই বিপুলবাবুর দাপট উধাও। তোতলাতে শুরু করেছেন, 'কা-কা-কা...লোর ওপর প্রতিশোধ নেবে নাও। আ-আ-মার ওপর কেন?'

'কালো-ঘণ্টার হিসেব পরে হবে। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ না করে শুয়ে পড়ুন তো দেখি।'

কথার ধাক্কাতেই ক্যাম্পখাটে গড়িয়ে পড়ে গেলেন বিপুলবাবু। এক তাগড়াই-এর ইশারামাত্র দুই ব্লাড ব্যাঙ্কের কর্মী ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল।

তাগড়াই হুঙ্কার ছুড়ল, 'নিন রক্ত। স্টার্ট করুন।'

ব্লাড ব্যাংকের এক কর্মী মিনমিন করে বলল, 'এঁর রক্ত কি নেওয়া যাবে?'

'কেন যাবে না?'

'এঁর শরীরে কি রক্ত আছে। হাফ লিটার কি বেরোবে?'

'দেখুন টেনে যতটা হয়। এই সাহিত্যিকের জন্যই আজ আমাদের বিহঙ্গ রায়কে পাওয়া হল না।'

অপর তাগড়াই বলল, 'সাহিত্যিক হয়েছেন, সমাজসেবা করতে এসেছেন, শরীর থেকে একটু রক্ত ঝরাবেন না? জানেন,

ঝন্টু সাহা গত বছর দু-বোতল রক্ত দিয়েছিল!'

'বিপুলবাবুর মুহূর্তের জন্য মনে হল ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠেন। রক্তে তাঁর ভয়। সুচেও। মরে গেলেও কখনও তিনি ইঞ্জেকশান নেন না। আজ এমন অবস্থায় পড়তে হবে জানলে...। পুলিশ কোথায় গেল, পুলিশ? খবরের কাগজের লোকরাই বা এক্ষুনি আসে না কেন?

প্যাঁট করে হাতে কী ফুটে গেল। মুহূর্তের জন্য পিঁপড়ে কামড়ানোর অনুভূতি, কিন্তু তার পরে আর কষ্ট নেই। মুদিত নয়নে রক্তদান করছেন বিপুল সেনাপতি।

বাইরে হট্টগোল বাড়ছে। আরও বাড়ছে। কারা যেন জোর করে ঢুকতে চাইছে শিবিরে, দুই তাগড়াই প্রবল বিক্রমে আটকাচ্ছে তাদের। সমস্বরে কারা স্লোগান দিয়ে উঠল, 'সমাজসেবা মাই কি জয়!'

বিপুল সেনাপতিও অস্ফুটে বললেন, 'জয়!'

স্মৃতিধরের বিস্মৃতি

স্টাফরুমে ফিরে, নিজের চেয়ারটিতে বসে, একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন স্মৃতিধরবাবু। এখন, এই বিকেলের দিকটায়, বেশ ক্লান্ত ক্লান্ত লাগছে। অবশ্য ক্লান্ত তো হওয়ারই কথা। সকাল থেকে পরপর অনেকগুলো অঙ্ক আর বিজ্ঞানের ক্লাস নিতে হয়েছে আজ। গত পিরিয়ডে তো বেজায় ধকল গেল। ক্লাস এইটে পাটিগণিত করাচ্ছিলেন স্মৃতিবাবু, একটা অতি সামান্য অঙ্ক বোঝাতে গিয়ে হিমশিম খাওয়ার জোগাড়। এক চৌবাচ্চায় তিনটে নল দিয়ে জল ঢুকছে, আর দুটো নল দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, পাঁচখানা নলই একসঙ্গে খোলা থাকলে কতক্ষণে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হবে—এই তো অঙ্ক! হ্যাঁ এটা ঠিক, নলগুলোর রকমফের আছে। কোনওটা দিয়ে দশ মিনিটে চৌবাচ্চা ভরতি হয়, কোনওটা দিয়ে পনেরো মিনিটে, তো কোনওটায় বিশ মিনিটে। আর ওদিকে একটা নলে আধ ঘণ্টায় খালি হয় চৌবাচ্চা, অন্য নলটায় এক ঘণ্টায়। এত সোজাসাপটা সমস্যা যাদের মাথায় ঢোকে না, সেসব ছাত্রদের মগজটাই তো গোবরপোরা, নয় কি?

অঙ্কটার কথা মনে হতেই স্মৃতিধর মিটিমিটি হাসলেন। ছেলেগুলো একেবারেই গাধা! বলে কিনা অতগুলো নলের দরকার কী স্যার? একটা নল দিয়ে ঢুকিয়ে আর একটা দিয়ে বার করে দিন না! বাধ্য হয়ে স্মৃতিধরকে বলতে হল, 'ওরে বোকার দল, সে তো করাই যায়। কিন্তু তোরা তাহলে এরিথমেটিক শিখবি কী করে? আর অঙ্ক না শিখলে কি মস্তিষ্ক পরিপক্ক হয়?'

ভাবতে ভাবতে স্মৃতিধর উঠে দাঁড়ালেন। আর একটা অঙ্ক ভাঁজছেন মনে মনে। এবার যেন কাদের ক্লাস? নাইন? টেন? রুটিনটা খুঁজলেন টেবিলে, দেখতে পেলেন না। কোথায় গেল? জিগ্যেসই বা করবেন কাকে। স্টাফরুম তো ফাঁকা! অন্য শিক্ষকরা কি সবাই ক্লাস নিতে গেছেন? তিনি একাই বসে বসে সময় নষ্ট করছিলেন?

ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্মৃতিধর হাঁক পাড়লেন, 'সুরেশ...? সুরেশ...?'

বারকয়েক ডাকাডাকির পর বছর পঁচিশেকের এক রোগা-পাতলা ছেলে ঘরে ঢুকেছে, 'কাকে ডাকছিলেন স্যার?'

'তোমাকেই তো ডাকছি।'

'বলুন স্যার?'

'তোমার আক্কেলটা কী বলো তো সুরেশ? টেবিল থেকে রুটিন কোথায় সরিয়ে রেখেছ?'

'আমি তো সুরেশ নই স্যার। আমি দিবাকর।'

'তুমি সুরেশ ছিলে না? কবে থেকে দিবাকর হলে?'

'আমি তো স্যার চিরকালই দিবাকর। সেই জন্ম ইস্তক।'

'অ।' স্মৃতিধরের যেন ঠিক প্রত্যয় হল না। দিবাকরকে এখনও কেন যেন সুরেশই মনে হচ্ছে তাঁর। দুনিয়াসুদ্ধু লোক তাঁকে ভুলো বলে বটে, কিন্তু সকাল-বিকেল যাকে স্কুলে দেখছেন, তার নাম ভুলে যাওয়ার মতো বেভুল তো তিনি নন! তবে অবশ্য আর বাদ-প্রতিবাদে গেলেন না। ছেলেটা যদি নিজেকে দিবাকর ভাবতে চায়, ভাবুক। গলা ঝেড়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি রুটিন আর চক-ডাস্টার দাও, আমার ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ছেলেটা এবার ফিকফিক হাসছে, 'ক্লাস কী করবেন স্যার? স্কুল তো ছুটি হয়ে গেছে।'

'কেন?'

'বা রে, চারটে বেজে গেছে তো।'

চমকে কবজি উলটে ঘড়ি দেখলেন স্মৃতিধর। হ্যাঁ, তাই তো! চারটে পনেরো! ছুটির ঘণ্টা পড়েছিল বলেই কি ছেলেগুলো তখন অমন উল্লাস করতে করতে বেরিয়ে গেল? স্টাফরুমও কি তাই এত শুনশান?

দিবাকর, যাকে কিনা এখনও সুরেশই মনে হচ্ছে স্মৃতিধরের, কান এঁটো করে হাসল, 'আপনিও এবার যান স্যার। স্টাফরুমে তালা ঝোলাব।'

মাথা চুলকোতে-চুলকোতে স্মৃতিধর বেরিয়ে এলেন ঘর ছেড়ে। বাইরে এসে দেখলেন, তিনি আর ওই ছেলেটি ছাড়া স্কুল কম্পাউন্ডে জনমনিষ্যি নেই। এক গাল জিভ কেটে, লজ্জা লজ্জা মুখে সাইকেলটা নামালেন বারান্দা থেকে। চড়তে গিয়েও থমকেছেন। তিনি ডান দিকের প্যাডেলে পা রেখে চাপেন সাইকেলে। অভ্যেস। সেই মতো একখানা দড়ি জড়ানো থাকে ডান প্যাডেলটায়। কিন্তু কী সর্বনাশ, দড়ি তো নেই! নির্ঘাত কোনও দুষ্টু ছাত্র খুলে নিয়েছে দড়িটা। এবার? কী করে তিনি ডান-বাঁ বুঝবেন?

আচমকাই একটা হাসি খেলে গেল স্মৃতিধরের মুখে। এ তো খুব সহজ অঙ্ক। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ে গিন্নি তো বলেই দিলেন, তিনি বাঁ হাতে ঘড়ি পরেছেন। তাহলে যে হাতে ঘড়ি নেই, সেটাই নিশ্চয়ই ডান হাত! আর সেই হাতের নীচেই যে পাটা রয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই ডান পা! অতএব তিনি যদি এখন সাইকেলের পিছনে গিয়ে সাইকেলের সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়ান, তাহলে তাঁর ডান পা সাইকেলের যেদিকে থাকবে, সাইকেলের ডান প্যাডেলও নিশ্চয়ই সেদিকেই পড়বে!

জটিল অঙ্কটার সমাধান করে ভারী আহ্লাদিত মুখে সাইকেলে চাপলেন স্মৃতিধর। গেট পেরিয়ে চলে এলেন রাস্তায়। নতুন একটি অঙ্ক জেগেছে মাথায়। তাঁর সাইকেলের

সামনের চাকার ব্যাস যদি পিছনের চাকার ডবল হয়, তাহলে প্রথম চাকাটি যখন বাড়ির গেটে পৌঁছোবে, পিছনের চাকাটি ঠিক কতটা দূরে থাকবে? আর স্মৃতিধরই বা সেই সময়ে কোন চাকার বেশি কাছে থাকবেন? সামনের? না পিছনের?

এমন একটি মনোরম অঙ্ক পেয়ে স্মৃতিধরের মেজাজ ভারী ফুরফুরে হয়ে গেল। সাইকেল চালাতে চালাতে গভীর মনোযোগে কষছেন অঙ্কটা। পাশ দিয়ে হুশহাশ ছুটে যাচ্ছে গাড়ি, বাস, ট্যাক্সি, অটো, রিকশা, সাইকেল। স্মৃতিধরের কোনও দিকে হুঁশ নেই। মালবোঝাই গরুর গাড়িও টপকে গেল তাঁকে। রাস্তার ধার ঘেঁষে একইরকম শম্বুকগতিতে এগোচ্ছে স্মৃতিধরের চিন্তামগ্ন সাইকেল।

হঠাৎই সামনে এক যুবক—'কী মামা, ফিরছ নাকি?'

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল সাইকেল। কোনওক্রমে মাটিতে পা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছেন স্মৃতিধর। অবাক মুখে বললেন, 'কে তোমার মামা, ভাই?'

'যাচ্চলে! সাধে কি লোকে তোমায় বিস্মৃতিবাবু বলে! আমি তোমার ভাগনে। নাড়ু।'

নামটা যেন শোনা শোনা! মুখটাও একেবারে অপরিচিত লাগছে না যেন! স্মৃতিধর অল্প হাসলেন, 'ও। তুমি এদিকে কোথায়?'

'তোমার বাড়িতেই তো গেছলাম।...বেড়ে হয়েছে কিন্তু বাড়িখানা।'

স্মৃতিধর ফ্যালফ্যাল চোখে তাকালেন। এ কথার কী অর্থ? হঠাৎ তাঁর বাড়িরই বা প্রশংসা কেন?

নাড়ু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'যাও, যাও, আজ আর দেরি কোরো না। মামি তোমার জন্য ওয়েট করছে।'

এ কথারও কিছু মাথামুণ্ডু খুঁজে পেলেন না স্মৃতিধর। আজ কী এমন বিশেষ দিন? যার জন্য গিন্নি তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন?

নাড়ু ফের বললে, 'আর হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে, রসগোল্লা কিনে নিয়ে যেতে হবে? অন্তত পঞ্চাশটা? সন্ধেবেলা আজ কম লোক তো আসবে না!'

নাড়ু তাঁকে অতিক্রম করে চলে যাওয়ার পরও বেশ খানিকক্ষণ ধন্দমাখা মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন স্মৃতিধর। একের-পর-এক হেঁয়ালি। কী এমন কাণ্ড ঘটল, যে তাঁর বাড়িতে সন্ধেবেলা মস্ত জমায়েত হবে?

যাক গে যাক, নাড়ু যখন বলল, মিষ্টি নিয়ে যাওয়াটাই সঙ্গত। একটু গিয়ে সাইকেল থেকে নেমেই পড়লেন স্মৃতিবাবু। গুটিগুটি পায়ে ঢুকেছেন এক দোকানে। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে নির্দেশ ছুড়লেন, 'পঞ্চাশখানা রসগোল্লা দিন তো ভাই। একটা বড় হাঁড়িতে।'

গোলগাল চেহারার দোকানদারটি বিরক্ত মুখে বলল, 'এখানে রসগোল্লা পাওয়া যায় না।'

'কেন?'

'দেখে বুঝছেন না? এটা মুদির দোকান।'

'ও হরি, তাও তো বটে!' স্মৃতিধর অধোবদনে বেরিয়ে এলেন। পরপর পাঁচটি দোকান নিরীক্ষণ করলেন সতর্ক চোখে। অবশেষে এক দোকানের শোকেসে গামলায় রসগোল্লা ভাসতে দেখে নিশ্চিত হয়েছেন, নাহ্, ময়রার দোকান ছাড়া এ হতেই পারে না।

রসগোল্লার হাঁড়ি হাতে স্মৃতিবাবু ফিরলেন সাইকেলে। আবার সেই সমস্যা। তবে চিন্তার কারণ নেই, সমাধানটা স্মরণেই আছে। ঘড়ি, বাঁ কবজি, বাঁ হাত, ডান হাত, ডান পা, ডান প্যাডেল—হুবহু সিঁড়িভাঙা অঙ্ক। হ্যান্ডেলে হাঁড়ি ঝুলিয়ে স্মৃতিবাবু ফের উঠলেন সাইকেলে। চলেছেন বাড়ির পথে। ধীরে, অতি ধীরে। আবার সেই চাকার অঙ্ক কষতে কষতে। বড়রাস্তা ছেড়ে ঢুকলেন ছোটরাস্তায়। তারপর কবজি দেখে দেখে একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে, আবার বাঁয়ে। অঙ্ক মাফিক পৌঁছেও গেলেন বাড়ির দরজায়। যাক নিশ্চিন্ত, আজকের মতো গৃহ অভিযান শেষ।

কিন্তু এ কী কাণ্ড, স্মৃতিধরের বাড়ির দরজায় এত বড় তালা ঝুলছে কেন? কোনও সাড়াশব্দও তো পাওয়া যাচ্ছে না কারোর? অথচ এইমাত্র নাড়ু বলল গিন্নি নাকি তাঁর অপেক্ষায় আছেন! তালা আটকে ভেতরে কী করছে সবাই? টুঁ শব্দটি না করে? এও কি হেঁয়ালি?

মুচকি হেসে স্মৃতিধর পকেট থেকে নিজের চাবিটি বার

করলেন। ঢুকিয়েছেন তালায়। আশ্চর্য খোলে না কেন? ভুল চাবি নিয়ে বেরিয়েছিলেন? নাকি দরজায় ভুল তালা ঝুলছে? নাহ্, বোঝা যাচ্ছে না। আর কী হতে পারে? নিশ্চয়ই তিরিশ বছর ধরে যে বাড়িতে বাস করছেন, সেটি চিনতে তাঁর ভুল হচ্ছে না?

তবু একবার রাস্তায় নেমে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন স্মৃতিধর। হ্যাঁ, এই তো সেই একতলা বাড়ি! ওই তো সেই ছাতাপড়া দেওয়াল, বাড়িওয়ালা যেটা রং করে দিচ্ছে না। ওই তো তাঁর ছাদ, যেখানে মাদুর পেতে শুয়ে রাত্তিরবেলা তিনি তারা গোনেন! তাহলে গণ্ডগোলটা কোথায়?

চকিতে নতুন এক চিন্তা মগজে পাক খেয়ে গেল। এমন নয় তো, গিন্নি আর ছেলেমেয়েরা তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে? সদরে প্রকাণ্ড তালা এঁটে খিড়কি দিয়ে অন্দরে ঢুকে আছে? পরখ করতে চায়, চালাকিটা স্মৃতিধর ধরতে পারেন কি না? হুঁহুঁ বাবা, স্মৃতিধর রায়ের অঙ্ক কষা মস্তিষ্ককে ধোঁকা দেওয়া অত সহজ নয়!

পা টিপে টিপে স্মৃতিধর বাড়ির পিছনপানে গেলেন। নীচু গলায় বললেন, 'টুউকি!'

জবাব নেই।

স্মৃতিধর সামান্য গলা ওঠালেন, 'টুকি!'

কোনও আওয়াজ এল না অন্দর থেকে।

এবার কেমন যেন সন্দেহ হল স্মৃতিধরের। সন্তর্পণে ঠেললেন খিড়কির দরজাটা। এ কী, এ যে ভেতর থেকে বন্ধ! বাড়ির লোকজন তবে আছে কী করে অন্দরে? কোনও একটা বাড়িতে ঢোকার দুটো মাত্র দরজা, একটা বাইরে থেকে বন্ধ, অন্যটা ভেতর থেকে আটকানো—এ তো বেশ জটিল অঙ্ক! একটা সমাধান আছে অবশ্য। একটাই। যদি বাড়ির লোক পাঁচিল টপকে...! তাহলে তো স্মৃতিধরকেও পাঁচিল পেরোতে হয়। বাহান্ন বছর বয়সে পারবেন কি?

না, হার মানতে স্মৃতিধর রায় রাজি নন। বুদ্ধির খেলায়, অঙ্কের প্যাঁচে, তাঁকে কেউ কাবু করবে, এ তো পারে না। হাত বাড়িয়ে পাঁচিলের মাথাটা ধরলেন স্মৃতিধর। দু-হাতের চাপে শরীরটাকে ওঠানোর চেষ্টা করছেন। একটুখানি উঠছেন, সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্। নেমে আসছে অনভ্যস্ত দেহ।

তখনই পিছনে এক বাজখাঁই গলা, 'অ্যাই, কে রে? কে রে?'

ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে স্মৃতিধর ছেড়ে দিলেন পাঁচিল। ঘুরে তাকাতেই জাঁদরেল স্বর পলকে মোলায়েম, 'ওমা, স্মৃতিবাবু যে! খামোখা বাড়ির পাঁচিল খামচাচ্ছেন কেন?'

স্মৃতিধর আমতা আমতা করে বললেন, 'ঢুকতে পারছি না...'

'আহা, বাড়িওয়ালাকে খবর দিলেই তো হয়।' প্রতিবেশী

সত্যরূপ কাছে এলেন, 'কিছু ফেলে-টেলে গেছেন নাকি?'

'ফেলাফেলির কী আছে?' স্মৃতিধর দুম করে রেগে গেলেন, 'আমার বাড়িতে আমি ঢুকব না?'

'সে কী মশাই, এ বাড়ি তো আপনি ছেড়ে দিয়েছেন।'

'মানে?'

'মানে তো আপনি বলবেন। পশ্চিমপাড়ায় অত সুন্দর একটা বাড়ি বানিয়েছেন...পরশু আপনার নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ হল...কাল মালপত্র নিয়ে সবাই সেখানে চলে গেলেন...!'

হেঁয়ালিটা এতক্ষণে স্পষ্ট হল। নিজের ওপর চটতে গিয়েও স্মৃতিধর হেসে ফেললেন। আহা, কী এমন স্মরণশক্তি কমেছে তাঁর? এতদিনকার বাড়িটা চিনতে তো ভুল হয়নি। শুধু এখন কোথায় থাকছেন, সেটুকুই ভুলে গিয়েছিলেন, এই যা।

ফের অঙ্ক কষে সাইকেলে চাপলেন স্মৃতিধর। ভারী বিনয়ী গলায় সত্যরূপবাবুকে জিগ্যেস করলেন, 'আমার নতুন বাড়ির ঠিকানাটা কি আপনার কাছে আছে ভাই? যদি দয়া করে আমায় দ্যান...!'

বার্বেলিয়া

সকাল সকাল বাজার সেরে দিয়েই কাগজ-কলম নিয়ে বসে পড়েছিল অবনী। কাল রাত থেকে একটা কবিতার লাইন ফরফর উড়ছে মাথায়, এক্ষুনি কায়দা করে বেঁধে ফেলতে হবে। এক্ষুনি। তা কবিতা বাঁধা কি সহজ কাজ! দাদার টাই বাঁধার চেয়েও কঠিন। দুটো লাইন যাও বা ধরা দেয়, তৃতীয় লাইন পিছলে পিছলে যায়। কলম চিবোতে চিবোতে অবনীর দাঁত ব্যথা হওয়ার জোগাড়!

এমন সময় রিনির আবির্ভাব, 'কাকামণি, তোমার সঙ্গে দুজন দেখা করতে এসেছেন।'

'কে রে?'

'চিনি না। তোমার কোনও কবি-বন্ধুটন্ধু হবেন বোধ হয়।'

নির্ঘাত তপেশ আর দীপাঞ্জন। পরশু কফিহাউসে তার ঠিকানা নিয়েছিল, আজই হানা দিয়েছে তার কবিতার পিণ্ডি চটকাতে। অবনী সেদিন চারখানা কবিতা শুনিয়েছিল, আজ নিশ্চয়ই আটখানা শুনতে হবে। তপস্যার সময়ে এ ব্যাঘাত

ভালো লাগে!

দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ড্রয়িংরুমে এল অবনী। এসেই অবাক। দুটো সম্পূর্ণ অচেনা ছেলে, অবনীরই সময়বয়সি প্রায়, ঘরের মধ্যিখানে সানগ্লাস পরে দাঁড়িয়ে। অন্ধ নাকি! হাতে লাঠি নেই তো!

অবনী গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'বলুন।'

দুজনে একসঙ্গে সানগ্লাস খুলল। অনেকটা তলোয়ার খোলার মতো করে। কোরাসে বলল, 'আমরা এসেছি।'

কে রে বাবা। গুপ্তঘাতক নাকি। কবিদের অনেক চোরাশত্রু থাকে। তরুণ কবিদের তো আরও বেশি। বিশেষত যাদের অবনীর মতো বাজারে সবেমাত্র দুটো বই বেরিয়েছে। আজকাল চারদিকে কোটি কোটি কবি, যাদের কবিতার বই বেরোয়নি তারাই হিংসেয় জ্বলেপুরে মরে। এইজন্যই কি তপেশরা তার ঠিকানা নিয়েছিল!

অবনী একটু ভিতু গলায় বলল, 'কোত্থেকে এসেছেন? কেন এসেছেন?'

'বাঁটুলপুর।' অপেক্ষাকৃত লম্বা-চওড়া ছেলেটি বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। সানগ্লাস নাচাতে নাচাতে বলল, 'আমরা আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাই।'

'কেন?'

'আপনাকে সংবর্ধনা দেব।'

'কী দেবেন?' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না অবনী।

রোগা ছেলেটি বলল, 'সংবর্ধনা। মানে মালা, মানপত্র, আরও অনেক কিছু।'

অবনী ধপ করে সোফায় বসে পড়ল। এ ধরনের সংবাদকে কী বলে! বিনা মেঘে বজ্রপাত! না, না, বোধ হয় বিনা মেঘে রামধনু। ছেলে দুটো অন্য কোনও বিখ্যাত লেখক-কবির সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলেনি তো!

ক্রমে ব্যাপারটা খোলসা হল। দুই আগন্তুক নামতা পড়ার মতো করে জানাল সব। উত্তর চব্বিশ পরগনার বাঁটুলপুরের সেভেন বুলেটস ক্লাব প্রতি বছর তরুণ প্রতিভাদের সংবর্ধনা দেয়। এ বছর তারা অবনীকে বেছেছে। আগামী রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠান, সকাল দশটার মধ্যেই তারা নিতে আসবে অবনীকে, দুপুরে তাদের ওখানেই নাকি ঢালাও খাওয়াদাওয়ার আয়োজন।

অবনী যেন ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছিল। খুশির ঝোঁকে ভেতরে গিয়ে বউদিকে তিন কাপ চা পাঠাতে বলে এল। তারপর গ্রাম্ভারি মুখে সোফায় হেলান দিয়ে বসে বলল, 'তা আমি যাচ্ছি কীভাবে?'

রোগা ছেলেটি বলে উঠল, 'সেটা তো আমাদের ভাবনা। ঠিক দশটায় আপনার দরজায় গাড়ি লেগে যাবে।'

সকালে আজ কার মুখ দেখে উঠেছে অবনী! রিনির? ভাইঝিকে আজই আইসক্রিম খাওয়াতে হবে। দাদা-বউদি খুব ঠাট্টা করেন অবনীকে নিয়ে, 'কপিবর' বলে খ্যাপান, তাঁরা এখন দেখুন অবনী মোটেই ফ্যালনা নয়। আজ দরজায় গাড়ি আসছে, কাল গেটে এরোপ্লেন দাঁড়িয়ে থাকবে। সাঁ প্যারিস। সাঁ লন্ডন। সাঁ নিউ ইয়র্ক। নোবেল প্রাইজটা যেন কোথায় দেয়? স্টকহলম না?

ছেলে দুটো চলে যাওয়ার পর সত্যিই ক'দিন যেন আকাশে বিচরণ করল অবনী, মাটিতে আর পা পড়ে না। ছাব্বিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি একত্রিশ ইঞ্চি হয়ে গেছে, বন্ধুদের আসরে তুবড়ি ছোটাচ্ছে, দাদা-বউদি পর্যন্ত অবনীর অহঙ্কারের দাপটে গুটিয়ে কেঁচো। বউদি তো বলেই ফেললেন, 'তোমাকে আমরা চিনতে পারিনি অবনী।' দাদা বললেন, 'ওর প্রতিভা থাকবে না! কার ভাই দেখতে হবে তো।' রিনি তো আগাগোড়াই উত্তেজনায় ফুটছে। যেন তার কাকামণি নয়, তাকেই সংবর্ধনা দিচ্ছে বাঁটুলপুর।

রবিবার এসে গেল। কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে দাদার ইলেকট্রিক শেভারে দাড়ি কামিয়ে নিল অবনী, বউদির কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটল নিখুঁত করে। আজকাল আর উশকো-খুশকো কবিদের যুগ নেই, এমনভাবে সাজতে হবে যাতে কবি কবিও দেখায়, আবার চেহারায় একটা চেকনাইও থাকে। ঝাড়া

পঁয়তাল্লিশ মিনিট শ্যাম্পু সাবান মেখে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে রইল অবনী। কতবার যে চুলে চিরুনি চালাল। চুল ফোলা ফোলা থাকবে, অথচ উড়বে না, এমন করে সেট করা কি মুখের কথা! শেষে ব্যাকব্রাশটাই পছন্দ হল। নিজেকে কেমন অচেনা অচেনা লাগছে। তা লাগুক, জীবনের একটা স্মরণীয় দিন বলে কথা। ধোপভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগটি নিয়ে, বউদির পারফিউম গায়ে ছড়িয়ে অবনী যখন পূর্ণ সাজে প্রস্তুত, তখন ঘড়িতে ঠিক দশটা বাজতে পাঁচ।

গাড়ি এল দশটা দশে। পনেরোটা মিনিট যে কী টেনশানে কেটেছে অবনীর! গাড়ি দেখে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। যাক, সেদিন তা হলে সে দিবাস্বপ্ন দেখেনি! সত্যিই চলেছে বাঁটুলপুর!

অন্য দুটো ছেলে এসেছে আজ। দুজনেরই বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। একজনের পোশাক দারুণ রংচঙে, অন্যজনের কোমরে ইয়া চওড়া বেল্ট। গাড়িটার চেহারাও মন্দ নয়। একটু পুরোনো মডেলের বটে, সিটও কেমন এবড়োখেবড়ো, স্টার্ট নিতে গিয়ে বারকয়েক কিরিরি-কিরিরি করল, তবে খোলসটা দিব্যি চকচকে। বালিগঞ্জ ছাড়িয়ে ইস্টার্ন বাইপাসে পড়তেই ঝাঁকি দিয়ে পক্ষিরাজ হয়ে গেল গাড়িখানা।

ছুটছে গাড়ি। দুই হৃষ্টপুষ্টের মাঝখানে বসেছে অবনী। একটু

কুঁকড়ে মুকড়ে। ড্রাইভারের পাশের সিট খালি। অবনী ভাবল বলে, একজন সামনে গিয়ে বসুন না। কেমন বাধো বাধো ঠেকল। হয়তো সংবর্ধনা দিতে গেলে এভাবেই নিয়ে যেতে হয়।

চুপচাপ না থেকে কথা শুরু করল অবনী, 'এতটা পথ আমরা একসঙ্গে যাব, আমাদের মধ্যে তো আলাপ-পরিচয় হওয়া উচিত।' বলেই ডান পাশে ফিরল, 'আপনার নামটা কী ভাই?'

চওড়া বেল্ট তরতর জবাব দিল, 'আমাদের আসল নাম বাতিল হয়ে গেছে। আমরা ক্লাবের নামে পরিচয় দিই। আমি গুলি। আর ও হল গিয়ে ছর্‌রা।'

'কেমনধারা নাম?'

'বা রে, আমরা সেভেন বুলেট্‌স ক্লাবের ছেলে না! আগের দিন এসেছিল টোটা আর কার্তুজ। আরও তিনজন আছে। শেল, গোলা আর তোপ।'

'বাহ্‌, বেশ মজার ব্যাপার তো!'

'এটা আপনার মজা মনে হল? আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য জানেন? শিল্প, সাহিত্য, গান, বাজনা, অভিনয়, খেলাধুলো, সমাজসেবা—সাতটা দিকে বুলেটের মতো আমরা ছুটে যেতে চাই। আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট শস্ত্রপাণি সেন, আর সেক্রেটারি ধনুর্ধারী ধর আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে

তরুণ প্রতিভাকে সম্মান জানিয়ে আমরা সমাজের উন্নতি করতে পারি।'

নামগুলো একটু বেশি বিপজ্জনক কী! চম্বলের ডাকাতদের কোনও ব্রাঞ্চ নয় তো এরা! হলেই বা কী। অবনীর মতো এক ক্ষীণজীবি কবিকে নিয়ে কী আর করবে!

ঝোলা থেকে একটা লবঙ্গ বের করে অবনী মুখে পুরল। বউদি দিয়ে দিয়েছেন। যদি বক্তৃতা দিতে হয়, লবঙ্গ খেয়ে গলা গরম হবে।

একটা প্রশ্ন ক'দিন ধরেই মনে ঘুরছে। প্রশ্নটা করেই ফেলল অবনী, 'আচ্ছা, ভাই, চার দিকে এত কবি থাকতে আমাকেই আপনারা তরুণ প্রতিভা হিসেবে শনাক্ত করলেন কীভাবে?'

'কেন, আপনাকে টোটা-কার্তুজরা বলেনি?'

'না তো।'

'সিম্পল মেথড। বইয়ের ক্যাটালগ দেখে আপনাকে পছন্দ করেছি।'

'মানে?'

'মানে আবার কী। আমাদের বাঁটুলপুর লাইব্রেরির ব্রজধ্বজবাবু বইমেলার সব স্টল থেকে বইয়ের ক্যাটালগ এনেছিলেন, ওগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতেই আপনার নামটা মনে ধরে গেল।'

অবনীর গলায় লবঙ্গ আটকে গেল। কাশতে কাশতে বলল, 'ঠিক বুঝলাম না। নামে কী আছে?'

'নামেই তো সব। এমন লোককে আমরা ডাকতে চাই যাতে গোটা বাঁটুলপুর বলে, হ্যাঁ, লোকটার নাম আছে বটে।' ছর্‌রার গলা দিয়ে উত্তর ছিটকোচ্ছে, 'আগেরবার রঘু দে বলে এক গল্পলেখককে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম, সবাই নাক সিঁটকেছিল। এবার সব্বার মুখ সেলাই হয়ে যাবে। কোথায় রঘু দে, কোথায় অবনীন্দ্রনাথ বাগচী!'

অনেকটা নিভে গেল অবনী, তবে পুরোটা নয়। মনে মনে ভাগলপুরবাসী বাবা-মাকে প্রণাম জানাতে ভুলল না। নাম তাঁরা একটা রেখেছিলেন বটে! এমন ওজনদার নাম এখন ক'জনের থাকে! কলেজের বন্ধুরা খুব টিটকিরি মেরে বলত, অবনীন্দ্রনাথ নাম নিয়ে তুই ছেলেবেলায় কী করে হামা টানতিস রে! মুখ থুবড়ে পড়ে যেতিস না! তা যাই হোক, সেই নামের জোরেই না...!

অবনী ফের প্রশ্ন ছুড়ল, 'আমি যে তরুণ তা আপনারা জানলেন কী করে? সত্তর বছরের বুড়োও তো হতে পারতাম! ঠিকানাই বা পেলেন কোত্থেকে?'

'হা হা হা হা।' গুলি হাসিতে দশ দিক ঝাঁঝরা করে দিল, 'সেভেন বুলেট্‌স সব খবর জোগাড় করে নেয়। বাঁটুলপুর থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে একজনকে পাওয়া গেছে যিনি কবিতাও পড়েন। তিনিই আপনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ঠিকানাও।'

অবনী আর-একটু নিভল। বুকের ছাতি আবার কমে কমে ছাব্বিশ। ঘাড় ঝুলিয়ে বসে আছে। বাঁটুলপুরে কবিতার জনপ্রিয়তা দেখে সে রীতিমতো চিন্তিত। যাকগে, দাদা-বউদি, রিনি কিংবা বন্ধুরা তো এ সব জানছে না, তারা দেখবে ফলক স্মানপত্র মেডেল এইসব।

ঢোক গিলে অবনী জিগ্যেস করল, 'আজ কী হবে ওখানে?'

'মুরগি।' ছর্‌রা ঝটিতি জবাব দিল।

অবনীর মুখ থেকে লবঙ্গটা ঠিকরে বেরিয়ে গেল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুরগি হবে এ কেমন কথা? তাকে কি মুরগি হতে হবে? স্কুলে অঙ্কের ক্লাসে শীতল-সার বাজখাঁই গলায় হাঁক পাড়তেন, 'অবনী, তুই গুণটাও পারিসনি! মুরগি হ।' অমনি সুড়ুত করে হাইবেঞ্চের নীচে মাথা গলিয়ে দিত অবনী। তবে সেখানে শুধু ক্লাসের বন্ধুরা থাকত। আজ যদি রাশি রাশি অপরিচিত জনতার সামনে...!

ম্রিয়মাণ গলায় অবনী বলল, 'মুরগি হওয়াটা কি খুব জরুরি?'

ছর্‌রা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, 'মুরগিতে আপনার আপত্তি আছে? তা হলে তো পাঁঠার কথা ভাবতে হয়। ওখানে একরকম ঠিক হয়ে আছে...'

অবনীর হাত ঘামতে শুরু করল। পাঁঠা হওয়া আবার কীরকম রে বাবা? চার পায়ে হাঁটতে হবে? ম্যাম্যা ডাকতে

হবে? স্টেজে সেটা খুব দৃষ্টিকটু দেখাবে না? এত সুন্দর করে পাজামা কেচে মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করে দিয়েছেন বউদি, হাঁটুর কাছটা নোংরা হয়ে যাবে! জিন্‌স পরে এলেই হত!

গুলি মাথা চুলকোচ্ছে, 'প্রবলেমে ফেলে দিলেন দাদা। আমাদের ওখানে পাঁঠা রোজ কাটা হয় না, তাই মুরগির ব্যবস্থাই করেছিলাম। যাক, আপনি অতিথি মানুষ...'

'ও, আপনারা খাওয়ার কথা বলছেন!' অবনী একটা দু-মণি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'না, না, পাঁঠা আবার কেন? মুরগিই আমার বেশ চলে।'

'বাঁচালেন। আর কী মেনু শুনবেন?'

'শোনাই যাক।' অবনী নড়েচড়ে বসল।

'রুই মাছের পয়োধি, কই মাছের গঙ্গা যমুনা, বিরহীর রসগোল্লা, রানাঘাটের ল্যাংচা...'

সহসা খাদ্যতালিকার সঙ্গে তাল রেখে চকাম চকাম শব্দ শুরু করেছে গাড়িটা। যেন খুশিতে লাফাচ্ছে। বাইপাস ছাড়িয়ে ভি আই পি-তে পড়ে গেছে বহুক্ষণ, দমদম প্রায় এসে গেল।

অবনী সিটে মাথা রাখল, 'বাঁটুলপুর আর কতক্ষণ ভাই?'

'এই তো এসে গেলাম।' ছোকরা ড্রাইভার ঘাড় ঘোরাল, 'সামনে মধ্যমগ্রাম, তারপর বারাসাত, তারপর আরও আধঘণ্টাটাক গেলে গাদামারা হাট, সেখান থেকে ডাইনে বিশ মিনিট গেলেই বাঁটুলপুর।'

মোট কতক্ষণ লাগবে মগজে ঢুকল না অবনীর, তবু বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল। যে প্রশ্নটা বেলাইনে চলে গেছে, তাতেই ফিরল আবার। বলল, 'আপনাদের অনুষ্ঠানে আজ কী কী হচ্ছে?'

'যা যা হয়। প্রথমে উদ্বোধনী সংগীত, তারপর আপনাদের বরণ...'

'আমাদের মানে? আমি ছাড়া আরও কেউ আছেন নাকি?'

'একজনকে দিলে কি পড়তায় পোষায়!' গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করছে এমন ভঙ্গিতে গুলি বলল, 'আপনি ছাড়া আছে দীপালি ভট্টাচার্য।'

'কোনও তরুণ মহিলা কবি নাকি! নামটা তো একদম না-শোনা!' অবনী কৌতূহলী হল, 'ক'দিন ধরে কবিতা লিখছেন ভদ্রমহিলা?'

ছর্‌রা চোখ বেঁকিয়ে তাকাল, 'মহিলা কেন হবেন? উনি পুরুষ। দীপালিবাবু একজন নবীন বডি বিল্ডার। মিস্টার বেঙ্গল প্রতিযোগিতায় উনি এবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। পুরো নাম দীপালিবরণ ভট্টাচার্য।'

উত্তরের ধাক্কাটা এবার অবনীকে সামলাতে হল না, গাড়িটাই তিড়িং-বিড়িং লাফাতে শুরু করেছে। যেন কেউ কাতুকুতু দিচ্ছে পক্ষিরাজকে। বিশ-পঞ্চাশ গজ এগিয়ে প্রকাণ্ড এক অট্ট লাফ ছাড়ল, তারপরেই নীরব। নিথর।

গুলি আর ছর্‌রা যেন প্রস্তুতই ছিল। দরজা খুলে ছিটকে নেমে গেছে। অবনী কিছু বোঝার আগেই ঠেলতে শুরু করেছে গাড়ি। দু-পা, সাত পা, বিশ পা, চল্লিশ পা। গাড়ির ইঞ্জিন কিছুতেই আর শব্দ করে না। ড্রাইভার দু-পায়ে প্রাণপণে ক্লাচ অ্যাক্সিলেটার চেপে চলেছে, তবু কোনও সাড়া নেই।

অবনী শঙ্কিত স্বরে বলল, 'গাড়ি কি স্টার্ট হবে না?'

'হতে পারে।' ড্রাইভারের চোখ সামনের কাচে স্থির, 'আর একটু জোর লাগানো দরকার।'

বলা উচিত নয় জেনেও বলে ফেলল অবনী, 'আমি ঠেললে কি কাজ হবে?'

'আপনি!' ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে অবনীর একচল্লিশ কেজির চেহারাটাকে অবজ্ঞাভরে জরিপ করল, 'দেখুন চেষ্টা করে।'

কিমাশ্চর্যম! অবনী হাত ছোঁয়াতেই গাড়ি গর্জন করে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি আর ছর্‌রা তীরবেগে উঠে গেছে গাড়িতে। অবনীর পাঞ্জাবিতে একরাশ কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে নিমেষে হুশ করে গাড়ি বেরিয়ে গেল। অবনী পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে, রোক্‌কে রোক্‌কে। গাড়ি আর থামে না। হাঁচোড়পাঁচোড় করে ছুটছে অবনী, গাড়ি থামেই না।

সিকি মাইলটাক গিয়ে দাঁড়াল গাড়ি। ব্যাক গিয়ার দিয়ে হাত-পাঁচেক পিছিয়ে এল। গুলি আর ছর্‌রা গাড়ি থেকে নেমে

একযোগে ডাকছে, 'আসুন দাদা, আসুন দাদা।'

প্রায় টলতে টলতে দৌড়চ্ছে অবনী। গাড়ির কাছে পৌঁছে নেতিয়ে পড়ল। ধরাধরি করে তাকে গাড়িতে তুলেছে গুলি আর ছর্‌রা। সিটে বসে জিভ বেরিয়ে গেল অবনীর। কোনওরকমে বলল, 'একটু জল!'

বাঁটুলপুর পৌঁছোতে দেড়টা বেজে গেল। বীরনগর থেকে দীপালিবরণ এসে গেছে অনেকক্ষণ, অবনীর জন্যই অপেক্ষা করছিল সবাই। অবনী গাড়ি থেকে নামতেই সোজা ব্রজধ্বজবাবুর বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল তাকে, সেখানেই আজ দুপুরে থাকা-খাওয়ার আয়োজন।

পাত পাতাই ছিল, ভোজন শুরু হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এলাহি বন্দোবস্ত। প্রতিটি আইটেমই অতি সুস্বাদু, কোনটা ছেড়ে কোনটা যে খায় অবনী! পথের ধকলে খিদেও পেয়েছে জব্বর, যেন বিশটা ছুঁচো ডন মারছে পেটে, বিনা বাক্যব্যয়ে খেয়ে চলেছে অবনী। ব্রজধ্বজবাবু নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়ার তদারকি করছেন, শস্ত্রপাণি আর ধনুর্ধারীবাবু নির্দেশ দিচ্ছেন, সাত বুলেট ক্ষিপ্র গতিতে পরিবেশন করছে। দীপালি বেশ সাত্ত্বিক ধরনের ছেলে, পরিমিত আহার পছন্দ করে, কোনও মাছ, কোনও মিষ্টি সে এক ডজনের বেশি খায় না। মাংসও একেবারে মেপেজুপে

এক কেজি। সেও আজ উপরোধে পড়ে দেড়া খেয়ে ফেলল, অবনী তো খাবেই। নাঃ, বাঁটুলপুর গুণীর সমাদর করতে জানে!

খাওয়াদাওয়ার পর একটু ভয় ভয় করছিল অবনীর। পেটের মধ্যে যেন কী হয় কী হয় ভাব। ব্যাগ ঘেঁটে একটা হজমের বড়ি খুঁজল অবনী। নেই। তাড়াহুড়োয় নিতে ভুলে গেছে।

মনের জোর আনতে দীপালির সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল অবনী। তাদের জন্য একতলার একটা ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, পরিপাটি করে পাতা রয়েছে বিছানা। দুই অতিথি খাওয়াদাওয়ার পর খানিক জিরোবে গড়াবে। সেখানেই শুরু হল পরিচয়ের পালা।

অবনী খাটে আধশোয়া হয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনি কবে থেকে দেহচর্চা শুরু করেছেন?'

পাঁচ ফুট দু-ইঞ্চি হাইটের চওড়া কাঁধ, কোমর সরু দীপালি শবাসনে ছিল। সিলিংয়ের দিকে চোখ রেখেই মিহিগলায় বলল, 'বারো বছর বয়স থেকে। আপনার কাব্যচর্চা কবে থেকে শুরু?'

'আমারও বারো বছর বয়স থেকে। আমি যখন সেভেনে পড়ি তখন প্রথম কবিতা লিখেছিলাম।'

'বাহ্, বাহ্, আমাদের দুজনের তো খুব মিল! কবিতা গঠন আর দেহ গঠন দুটোই তো শিল্প, কী বলেন?'

'তা বটে, তা বটে।'

দীপালি জুলজুল তাকাল, 'আমিও মাঝে মাঝে কবিতা

লিখি। শুনবেন একটা?'

'শোনান।' অবনীর বেশ মজা লাগল। জীবনে অনেক কবির মুখ থেকে কবিতা শুনতে হয়েছে, বডি বিল্ডারের স্বরচিত কবিতা শোনার অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

দীপালিও ভারী উৎসাহ পেয়েছে। দু-পা জোড়া করে সোজা ওপরে তুলে দিল, পরক্ষণেই স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মতো ঝাং করে উঠে বসেছে। গম্ভীর স্বরে বলল, 'একটু আধুনিক কিন্তু।'

অবনী টান টান হল, 'আমিও আধুনিক। শুরু করুন।'

পলকের জন্য চোখ বুজল দীপালি। চ্যাপটা চিনাম্যানের মতো মুখখানা একটু তেবড়ে গেল ভাবে। চোখ বুজেই গড়গড় করে বলতে লাগল ঃ

'আহা কী জোছনাময়ী রাতি,
আকাশে উড়িছে একঝাঁক হাতি।
হলুদ বন, সবুজ বাঘ
ঘাস খাচ্ছে। খাক, খাক।
পরে চুপকি দিয়ে ছুপে নিলেই চলবে।'

পটাং করে চোখ খুলল দীপালি, 'কেমন লাগল?'

কদমছাঁট দীপালিবরণকে সত্যি বলার সাহস পেল না অবনী। জিভ তালুতে ঠেকিয়ে বলল, 'মন্দ কী।'

দীপালি পূরক করার ভঙ্গিতে শ্বাস টানল। মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, 'এ তো হল বন্য প্রাণী নিয়ে। গৃহপালিত জীব

নিয়েও আমার একখানা আছে।' বলেই শুরু করেছে ঃ

'বিড়ালের দাঁতে কুকুরের বিষ,
রুপোলি ময়না করে হিসহিস।
জালায় গোরু, খোঁটায় মাছ,
সবাই তোরা সুখে বাঁচ।
আমি আসি, তারপর তোদের হচ্ছে।'

দীপালি খোঁচা মারল অবনীর পেটে, 'কী, এটা কেমন?'

অবনী নয়, অবনীর পেটের ভেতরে মুরগিটা ককিয়ে উঠল, 'ভালোই তো। মন্দ কী।'

'আমার সব পাঁচ লাইনের। শরীর নিয়ে ব্যস্ত থাকি তো, তাই বিশেষ সময় পাই না। তবে আরও আছে আমার। পরিবেশের ওপর। একটা চারতলা বাড়ির ওপর। যোগব্যায়ামের ওপর।' বলতে বলতে হাত মুঠো করে লম্বা বাড়িয়ে দিল দীপালি, কাঁধ থেকে মুঠো দোলাচ্ছে সাপের মতো, 'আমার কথা তো অনেক হল, আপনার কথা বলুন। শরীর চর্চাটর্চা করা হয়?'

অবনী ভরসা করে বলতে পারল না, কলেজে পড়ার সময়ে একবার যোগব্যায়ামের সাধ জেগেছিল প্রাণে। পদ্মাসন দিয়ে গোড়াপত্তন করেই বিপত্তি। প্যাংলা প্যাংলা দু-পা এমন সেঁটে গেল, যেন দরজায় খিল পড়ে গেছে। দাদা-বউদি দুজনে মিলে চিমটি কেটে কেটে পা ছাড়ালেন।

অবনী হাসি হাসি মুখে বলল, 'আমিই বা সময় পাই কোথায়! সাহিত্যের সাধনাতেই আমার গোটা দিনটা কেটে যায়।'

'হুম। তবে শরীরচর্চাটাও একটু করলে পারতেন।' দীপালি ঘাড় নাড়ল, 'যাকগে, যাক। আপনি তা হলে আমার আরও কয়েকটা কবিতাই শুনুন।'

অবনী মনে-মনে আঁতকে উঠল। মিউ মিউ করে বলল, 'একটু গড়িয়ে নিলে হয় না? বিকেলে অত বড় একটা অনুষ্ঠান আছে...'

'আপনি গড়ান, আমি একটু জায়গাটা চক্কর দিয়ে আসি। দুপুরের খাওয়াটা আমায় পাঁচটার মধ্যে হজম করতে হবে।'

দীপালি বেরিয়ে যেতেই শরীর ছেড়ে এল অবনীর। দু-মিনিটেই নাক ডাকতে শুরু করেছে। ফরর্‌র, ফরর্‌র।

ঘুম ভাঙল একটা চাপা ক্যালব্যাল শব্দে। চোখ খুলতেই অবনী দেখল একপাল বাচ্চা খালি গায়ে ভিড় করেছে জানলায়, লোহার শিকে হুমড়ি খেয়ে দেখছে তাকে।

একটা বাচ্চা চিৎকার করে উঠল, 'অ্যাই তাকিয়েছে, তাকিয়েছে।'

অবনী ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা বাচ্চা চেঁচিয়ে উঠেছে, 'অ্যাই

নড়েছে, নড়েছে।'

একজন বলল, 'ওটা কবি?'

আর একজন বলল, 'না রে, ওটা মিস্টার বেঙ্গল।' সমবেত কণ্ঠে হাসির রোল উঠল।

প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করল অবনী। এবার হয়তো বাচ্চাগুলো গরাদের ওপার থেকে ছোলা ছুড়বে। হয়তো সুর করে বলবে, 'এই অবনী কলা খাবি? জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?'

অবনী হেঁকে উঠল, 'এই, হ্যাট হ্যাট।'

ছেলের পাল ভোঁ-দৌড় লাগিয়েছে। একটু তফাতে গিয়ে ঝুপ দাঁড়িয়ে পড়ল। আবার গুটি গুটি জানলার দিকে আসছে।

অবনী যে এখন কী করে! কোণের টেবিলে একটা পেপারওয়েট রাখা আছে, ছুড়ে মারবে? না কি ভেজিয়ে দেবে জানলা?

কিছুই করতে হল না। ত্রাণকর্তারা এসে গেছে। গোলা আর শেল তাকে নিতে উপস্থিত। দীপালি একডজন ডাব খেয়ে মঞ্চে চলে গেছে। অবনীকে যেতে হবে।

সেভেন বুলেট্‌স ক্লাবের সামনের মাঠে অনুষ্ঠান। মাঝারি মাপের মঞ্চ বাঁধা হয়েছে, তিনদিক খোলা, মাথার ওপরেও ঢাকা নেই কোনও। ফাল্গুন মাস, দখিনা বাতাস বইছে, ঠান্ডা লাগার ভয় নেই। মঞ্চের সামনেই শতরঞ্চি পাতা হয়েছে,

গুটিপনেরো বাচ্চা গড়াগড়ি খাচ্ছে সেখানে। শতরঞ্চির পেছনে সারি সারি চেয়ার অর্ধেক ভরতি হয়েছে, এখনও লোক আসা বাকি। মঞ্চের পেছনে বড় ফেস্টুনে লেখা, গুণিজন সংবর্ধনা। সামনে দুটো ইয়া ইয়া লাইট ফোকাস মারছে।

মঞ্চে প্রকাণ্ড টেবিল, দুপাশে দু-খানা ফুলদানিতে রজনীগন্ধা। টেবিল ঘিরে চারটে চেয়ার, দুপাশে বসেছেন শস্ত্রপাণি আর ধনুর্ধারী, মাঝখানে অবনী আর দীপালির স্থান।

অনুষ্ঠান শুরু হল। মাইকের সামনে দাঁড়িয়েছে তোপ। গুমগুমে স্বরে ঘোষণা করল, 'প্রথমে উদ্বোধনী সংগীত।'

একটি বছর তেরোর মেয়ে স্টেজে উঠেছে। পরনে শাড়ি, লুটোচ্ছে। হারমোনিয়াম টেনে ভীষণ সরু গলায় গান ধরল, 'এ কোন সকাল আলোর চেয়ে অন্ধকার...'

অবনী পাশে বসা ধনুর্ধারীবাবুকে ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, 'এই গানটা কি ঠিক হচ্ছে?'

ধনুর্ধারীবাবুর লিকলিকে শরীর সামান্য হেলল। চাপা স্বরে বললেন, 'কেন, ভুল গাইছে?'

'না, তা নয়। তবে শুরুতেই অন্ধকার কি ভালো? তা ছাড়া এখন তো সকালও নয়!'

'এখনও অবধি ও একটা গানই তুলেছে।' ধনুর্ধারীবাবুর গলা আরও নেমেছে, 'ওটি আমার মেয়ে। গলাটা কেমন? ভারী সুরেলা না?'

অবনী চুপ হয়ে গেল। পাশে বসে থাকা দীপালির মুখে ভাবান্তর নেই। সামনে গান হচ্ছে, না ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে, তার মুখ দেখে বোঝে কার সাধ্যি! দীপালি বসেছে ভারী জবরদস্ত ভঙ্গিতে। দু-হাত আড়াআড়িভাবে বুকে আটকানো, কাঁধ স্থির, চোখ অচঞ্চল, মাথা সোজা। শস্ত্রপাণিবাবু চোখ বুজে মাথা দোলাচ্ছেন।

গান শেষ হল। আবার তোপধ্বনি, 'এবার গুণী বরণ।'

কোথা থেকে যেন হারমোনিয়াম বেজে উঠল, সঙ্গে তবলা। লালপাড় সাদা শাড়ি পরা তিনটি কিশোরী স্টেজে উঠে পড়ল। টেবিলের সামনের অপরিসর জায়গাটায় ঘুরে ঘুরে নাচছে, 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো...'

এতক্ষণে অবনীর মন ভরে গেল। একটু যেন লজ্জা লজ্জাও লাগছিল। সত্যিই তা হলে তার ধরাধামে আসাটা মহৎ ব্যাপার! বাঁটুলপুরই তাকে চিনল প্রথম!

আবার তোপ মাইকে এসেছে, 'এবার পুষ্পস্তবক প্রদান ও মাল্যদান।'

পাঁচ-ছ বছরের দুটো পুঁচকে মেয়ে, একজনের আবার ন্যাড়া মাথায় গোলাপি রিবন বাঁধা, অবনী আর দীপালিকে মালা পরিয়ে দিল, হাতে তুলে দিল ফুলের তোড়া। করতালি বেজে উঠল।

'এবার সভাপতির ভাষণ।'

শস্ত্রপাণিবাবু বক্তৃতা দিতে উঠলেন। অবনী আর দীপালিকে একটু ছুঁয়েই চলে গেলেন বাঁটুলপুরের জন্ম-ইতিহাসে। একটার পর একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন কেন বাঁটুলপুরের নাম ফণীমনসা বা তেঁতুলগঞ্জ হয়নি। কীভাবে তৈরি হয়েছে বাঁটুলপুরের স্কুল, বাঁটুলপুরের রাস্তাঘাট, বাঁটুলপুরের হাসপাতাল। বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল তাঁর।

এর মধ্যে স্টেজে দুটো রঙিন কাগজে মোড়া বাক্স এসে গেছে। ধনুর্ধারীবাবু অবনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন, 'আপনার জন্য শব্দকোষ। তিন ভলিউম। বজ্রধ্বজবাবু নিজে হাতে কিনে এনেছেন।'

ঘড়ি ধরে ঠিক আধ ঘণ্টা পর শস্ত্রপাণিবাবুর বক্তৃতা শেষ হল। ততক্ষণে সামনের সারির বাচ্চারা ঘুমিয়ে কাদা। এবার ধনুর্ধারীবাবুর মাইকে যাওয়ার পালা। তিনিও সময় নিলেন পাক্কা আধ ঘণ্টা। অবনী দীপালির নাম একবার করেই তিনি চলে গেলেন সেভেন বুলেটসের কর্মকাণ্ডে। যেমন চোখা তাঁর ভাষা, তেমনই তাঁর ভাষণের দাপট। তাঁর তীক্ষ্ণ স্বর যখন নীরব হল, তখন বাচ্চারা আবার চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসেছে।

তোপ আবার ঘোষণায় এল, 'এবার সংবর্ধনা জ্ঞাপন।'

অবনী আর দীপালি দুজনের গলাতেই মেডেল পরালেন

শস্ত্রপাণিবাবু। দুজনের হাতে রঙিন বাক্স তুলে দিলেন ধনুর্ধারীবাবু। অবনী নিজের বাক্সটা নিয়ে বসে পড়ল। বেশ ভারী ভারী ঠেকছে। হবেই তো। তিন ভলিউম শব্দকোষ বলে কথা!

'এবার আমরা দীপালিবাবুকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।'

দীপালি উঠে দাঁড়িয়ে পটপট করে জামা খুলে ফেলল। দু-হাত ছড়িয়ে বুক ফোলাতে ফোলাতে এগিয়ে গেল স্টেজের একদম সামনে। হাতের গুলি ফুলিয়ে বলল, 'আমার শরীরই আমার হয়ে কথা বলবে।'

ঘন ঘন হাততালি পড়ছে। দীপালি শরীরের নানান পেশি দেখিয়ে চলেছে। একটু কাত হয়ে এক হাঁটু গেড়ে বাইসেপ দেখাল। ট্রাইসেপ। এবার উলটো দিকে ঘুরে পুনরাবৃত্তি করছে। অবনী তাকিয়ে আছে সবিস্ময়ে। টিং-টিং মাসল নাচিয়ে চলেছে দীপালি। ডান হাত, বাঁ হাত, ডান পা, বাঁ পা। এবার সমতল পেটটাকে পুরো খাদে নামিয়ে দিয়েছে। খাদে নেমে যাওয়া পেটে ঢেউ তুলছে। ঢেউ, না হিল্লোল? হাততালিতে ভেঙে পড়ল গোটা মাঠ।

'এবার অবনীবাবু আপনাদের সামনে আসবেন।'

দীপালির খেলা দেখে সব গুলিয়ে গেছে অবনীর। ঠকঠক হাঁটু কাঁপছে, গলা শুকিয়ে কাঠ। ঝোলা ব্যাগে একটা বক্তৃতা লেখা ছিল, ব্যাগটা ভুল করে বজ্রধ্বজবাবুর ঘরেই ফেলে

এসেছে। নিয়ে আসতে বলবে ব্যাগটা? সময় নেই, তোপ আবার ডাকছে অবনীকে। কী বলবে? নিজের কবিতা শুনিয়ে দেবে?

দুরু দুরু বুকে মাইকের সামনে দাঁড়াল অবনী। হায় রে, একটা কবিতাও মনে আসছে না। চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করল প্রাণপণে। ওফ, চোখের সামনে শুধু বাইসেপ ট্রাইসেপ নাচছে, দীপালির পেট হিল্লোল তুলছে। কবিতারা সব গেল কোথায়!

মাইক ধরে ভেবলুর মতো দাঁড়িয়ে আছে অবনী। দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। তোপ পাশ থেকে বলল, 'কিছু বলুন। বাঁটুলপুরের লোকরা সাঙঘাতিক, কিছু না বললে চামড়া ছাড়িয়ে নেবে।'

অবনীর আরও গুলিয়ে গেল সব। হঠাৎই কোত্থেকে একটা কবিতার লাইন উড়ে এল মাথায়। নিজের নয়, রবি ঠাকুরের। সেই স্কুলে পড়ার সময়ে মুখস্থ করেছিল। গোটা মস্তিষ্ক তল্লাশ করেও আর কোনও দ্বিতীয় কবিতার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

অবনী মরিয়া হয়ে শুরু করে ফেলল, 'দেবতামন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ, জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন...'

পুরো কবিতাটা শেষ করে ঠকঠক কাঁপছে অবনী। এই বুঝি জুতো ছুড়ল দর্শকরা। পৈতৃক প্রাণ যায় যায়।

এ কী কাণ্ড! হাততালি পড়ছে যে! অবিরাম করতালিতে

মুখরিত গোটা বাঁটুলপুর। তোপ হাসিমাখা মুখে মাইকের সামনে এল, 'এতক্ষণ আপনাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন কবি অবনীন্দ্রনাথ বাগচী।'

গভীর রাতে সুদৃশ্য বাক্স নিয়ে বাড়ি ঢুকল অবনী। সেভেন বুলেট্‌সের গাড়ি রাতে স্টার্ট নেয় না, বাসেই ফিরেছে।

দাদা-বউদি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। রিনি অন্যদিন এত রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, আজ সেও জেগে আছে।

বাক্সটা দেখেই রিনি উচ্ছ্বসিত। 'কী পেলে গো কাকামণি?'

অবনী ক্লান্ত গলায় বলল, 'শব্দকোষ।'

বউদি বললেন, 'বাহ্, এত সুন্দর উপহার। তুমি কতদিন কিনবে কিনবে করছিলে। এবার তোমার কবিতা লেখার খুব সুবিধে হবে।'

'তা হবে।' অবনী বলল অস্ফুটে। মনে মনে বলল, কবিগুরুর কবিতাও যেখানে নিজের কবিতা বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, সেখানে আর কবিতা লিখে কী লাভ!

রিনি বাক্সটা খুলে ফেলেছে। চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা, এ তো বই নয়! হি হি হি হি। এ দুটো কী গো কাকামণি? বাপ রে, কী ভারী!'

অবনীও হাঁ। শব্দকোষ কোথায়, এ যে ছোট্ট ছোট্ট দুটো

বার্বেল! একদম মিনি সাইজ! নির্ঘাত দীপালির সঙ্গে বাক্স অদলবদল হয়ে গেছে। সে বেচারার কপালে শব্দকোষ পড়ল! তা ভালো, শব্দকোষ দেখে দেখে দীপালিই নয় লিখুক কবিতা।

অবনীর সব দুঃখ ঘুচে গেল। মুচকি হেসে বলল, 'ওটার নাম বার্বেলিয়া। এ এক অন্য ধরনের শব্দকোষ। সত্যিই আমার কাজে লাগবে।'

অবনী কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে। এখন নিয়মিত বার্বেলিয়া ভাঁজে। ছোট্ট ছোট্ট সুপুরির মতো দুটো গুলিও ফুটেছে তার হাতে। সকাল-বিকেলে চাকরির চেষ্টা করছে খুব। শিগগিরই পেয়ে যাবে।

কাকতালীয়

সকাল থেকেই অঙ্কে মন বসছিল না টুকানের। বাইরে অবিরাম ভোকাট্টার ফোয়ারা ছুটছে, এই সময়ে অ্যালজেব্রা কষতে কারুর ভালো লাগে? ধুৎতেরি বলে বইখাতা ফেলে উঠেই পড়ল টুকান। রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, মা কড়াইতে কী একটা চাপিয়ে খুন্তি দিয়ে নাড়ছেন। আহা, এই তো সুযোগ। এবার পা টিপে টিপে সরে পড়লেই তো হয়।

যা ভাবা, তাই কাজ। চুপিসাড়ে সিঁড়ি টপকে টুকান সোজা ছাদে। খোলা আকাশের নীচে এসে প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। বিশ্বকর্মা পুজোর সকালটা ঝলমল করছে, সোনালি রোদ্দুরে নীল চাঁদোয়ার গায়ে কত যে রংবেরঙি ঘুড়ির মেলা। চৌখুপ্পি, পেটকাট্টি, জয়হিন্দ্, চাঁদিয়াল, গঙ্গাযমুনা...। সবক'টা ঘুড়িকে নামে নামে চেনে টুকান। এক-একটা ঘুড়ি বাড়তে বাড়তে কোথায় যে চলে গেছে! ফুটকির মতো দেখাচ্ছে। যেন এক খুদে সম্রাট, হেলা ভরে অবলোকন করছে পৃথিবীকে। যে ঘুড়িগুলো কাছাকাছি, তাদের মধ্যে প্যাঁচ চলছে জোর। ওই তো একটা পেটকাট্টি একখানা জয়হিন্দ্‌কে কুচুৎ কেটে দিল।

অমনি বুম্‌বাদের ছাদে বিকট উল্লাসধ্বনি—ভোম্‌মারা!

আওয়াজটা শুনে মনটা কেমন স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেল টুকানের। বন্ধুদের কত জপিয়ে-জাপিয়ে সুতোয় মাঞ্জা দেওয়ার কলাকৌশল রপ্ত করেছে সে। কত গ্রাম কাচগুঁড়োর সঙ্গে ক'চামচ মাড় মেশালে সুতো তলোয়ারের মতো ধারালো হয়, টুকানের এখন মুখস্থ। এমনকী ডিম গুলে মাঞ্জা দিলে ক'টা দিন সুতো যে ইস্পাতের ছুরিকেও হার মানায়, তাও কি টুকানের অজানা! টানামাঞ্জা, লাটামাঞ্জার সূক্ষ্ম প্রভেদটাও সে রনিকে কত তেল মেরে মেরে শিখল। লাটামাঞ্জায় লাগে মিহি কাচের গুঁড়ো। কিন্তু টানামাঞ্জায় দুটো চারটে ছোটবড় টুকরো থাকলে ক্ষতি নেই। তা এত শিক্ষালাভ, এইসব তথ্য আহরণ, সবই তো বৃথা। টুকানের মা টুকানকে লাটাই-ঘুড়ি ছুঁতেই দেন না। ঘুড়ি ওড়ালে নাকি মনটাও হাওয়ায় উড়বে, এবং তাতে নাকি পড়াশোনার বারোটা! কী কষ্ট করেই না টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে টুকান একটা লাটাই কিনেছিল, মা'র হাতে পড়ে সেটা নিমেষে দু-টুকরো! নিষ্ঠুর, মা বড্ড নিষ্ঠুর।

অগত্যা কী আর করা। উদাস চোখে চাঁদিয়ালের গোঁৎ খাওয়াই দেখছে টুকান। বুকের ভেতর দুঃখী বাতাস বইছে হুহু।

ঠিক তখনই কানের পাশে বিটকেল ডাক, 'ক।'

টুকান চমকে তাকাল। কার্নিশে একটা কাক। ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে টুকানকেই নিরীক্ষণ করছে।

গোমড়া মুখে টুকান বলল, 'কী চাই?'

কাক বলল, 'কক্‌খ।'

টুকান আরও বিরক্ত হয়ে বলল, 'যা তো। ভাগ তো এখান থেকে।'

কাকটা কি টুকানের কথা বুঝতে পারল? উড়ে পালাল না অবশ্য, তবে পিছিয়েছে দু-তিন পা। জোড়া ঠ্যাঙে, লাফিয়ে লাফিয়ে। ফের ডাক ছাড়ল, 'কক্ ক্ক।'

টুকান হঠাৎই খেয়াল করল, ধ্বনিগুলো প্রত্যেকটাই কেমন আলাদা আলাদা। প্রথমে ক্ক, তার পরে কক্, তারপর কক্ ক্ক! কাকদের নিজস্ব কোনও ভাষা আছে নাকি?

পরখ করার জন্য টুকান বলল, 'যেতে বলছি না তোকে?'

তুরন্ত জবাব, 'ক্‌কা।'

'এবার কিন্তু আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। অবাধ্যতা আমি একদম পছন্দ করি না।'

দু-সেকেন্ড নীরব থেকে কাক উত্তর ছুড়ল, 'কা কক্।'

হ্যাঁ, টুকানের ধারণাই সঠিক। নিজস্ব ভাষাতেই টুকানের সঙ্গে কথোপকথন চালাচ্ছেন বায়সমশাই। মজা পেল টুকান। ভাষাটা শেখার চেষ্টা করলে কেমন হয়? কিন্তু তার জন্য তো টানা সংলাপ দরকার।

ঘুড়ি ভুলে টুকান কাককে নিয়ে পড়ল। চোখ নাচিয়ে বলল, 'তুই এখানে এসেছিস কেন বল তো?'

'খা।'

'খাবার-টাবারের ধান্দায় ঘুরছিস বুঝি?'

'কক্ কক্ কক্।'

'তো এখানে কেন? রাস্তায় যা।'

'কা কা কক্।'

'রাস্তায় কিছু জুটছে না? তাহলে দোতলায় গিয়ে দ্যাখ।'

'কা কা কক্।'

'আরে বাবা, আছে আছে। মা জানলায় জোয়ান শুকোতে দিয়েছে।'

'কা কা কা কা।'

'ঝাল লেগেছে বুঝি? টেস্ট করে দেখেছিস?'

'খক্।'

অর্থাৎ হ্যাঁ। টুকান চোখ পিটপিট করল। সে তো চমৎকার কাকের কথা বুঝতে পারছে! কাকেরও বলিহারি যাই, দিব্যি একটা ভাষা বানিয়ে ফেলেছে! দুটো মাত্র অক্ষরকে খেলিয়ে খেলিয়ে কেমন সুন্দর প্রকাশ করছে মনোভাব!

কৌতূহলী মুখে টুকান জিগ্যেস করল, 'তোরা নিজেদের মধ্যে এভাবেই বাতচিৎ করিস নাকি রে?'

'কা ক।'

অর্থাৎ তোমাকে বলব কেন?

'আহা, শুনিই না।'

'কা কক্। কা কক্।'

বলেই কাকবাবু ডানা মেলে ধাঁ। মিনিটখানেক পর ফিরেছে এক সঙ্গীকে নিয়ে। দু-নম্বরটা ঘাড় নাচিয়ে নাচিয়ে দেখল টুকানকে। তারপর এক নম্বরকে বলল, 'কা কা কাখক্? এই ছেলেটার কথা বলছিলি বুঝি?'

'খক্! হ্যাঁ।'

'ককক্ ককক্ খক্? ব্যাটা ঢিল-টিল ছোঁড়ে না তো?'

'কাক্ কাক্। খ খ। না না, অনেকক্ষণ তো সামনে ছিলাম।'

'খাখাখা ক্‌ক। এমন ছেলে তো বড় একটা দেখা যায় না!'

'কাকক্ কখা। খা খা। কক্ কক্ কা। এও খুব সুবিধের নয়। তবে আজ এর খুব মন খারাপ।'

'ক্‌কা। কেন?'

দুই কাকের আলাপচারিতা টুকানের কাছে এখন জলবৎ তরলং। যেন তার কানে কেউ কাকধ্বনি বোঝার যন্ত্র লাগিয়ে দিয়েছে।

প্রথম কাকটা বলল, 'দেখছিস না, বেচারার ঘুড়ি নেই, লাটাই নেই, জুলজুল আকাশের পানে তাকিয়ে?'

'বাঁচিয়েছে।' দ্বিতীয় কাক বলল, 'ঘুড়ির উৎপাতে আজ আমাদের যা নাকাল দশা! ছাদগুলো পর্যন্ত ভরতি, কোথাও একটু বসার জো নেই!'

'কিন্তু ছেলেটার জন্য খুব মায়া হচ্ছে রে!'

'কী করবি? ঘুড়ি-লাটাই এনে দিবি?'

'দিলে হয়। দেখি কোথাও থেকে ম্যানেজ করা যায় কি না।'

ব্যস, দুজনে উড়তে উড়তে কোথায় যে উধাও হল! টুকান স্তম্ভিত। ছি ছি, এই কাকদের সে ঘেন্নাই করে এসেছে এতদিন! ঝাড়ুদার পাখি বলে অবজ্ঞাও তো কম করেনি। কিন্তু তারা যে আদতে এত সহৃদয়, টুকানদের মনখারাপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, এই গুণের কথা কে জানত!

টুকান আশায় আশায় দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়েই আছে। দু-মিনিট, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট...। নাহ্, দুই পরভৃতের আর দর্শন নেই। নিজেকে এবার কেমন বোকা বোকা লাগতে শুরু করেছে টুকানের। সত্যি কি কাকের ভাষা বুঝতে পারে নাকি মানুষ? টুকান ভাবলই বা কী করে, কাক মানুষের কথা বুঝবে? ব্যাটারা চশমা, আংটি, ঘড়ি, টুকুরটাকুর তুলে নিয়ে যায় বটে, তবে তা নিশ্চয়ই কাউকে উপহার দিতে নয়? অতএব অন্যের ঘুড়ি-লাটাই টুকানকে এনে দেবে, এমন এক উদ্ভট ধারণাও তো মূর্খামি।

আস্তে আস্তে মেজাজ চড়ছিল টুকানের। কাক দুটো তাকে উপহাস করে গেল না তো? টুকানকে ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো ছাদে দাঁড় করিয়ে রাখাটাই হয়তো কাকদের একটা খেলা। না, এবার আর ছাড়ানছোড়ন নেই, যেখানেই কাক দেখবে ঠাঁইঠাঁই

ইট ছুড়বে।

ছাদ থেকে একখানা ঢ্যালা কুড়িয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাল টুকান। কী আজব কাণ্ড, ধারে কাছে এখন একটাও কাক নেই! রনি জোজো বুম্‌বা ঝুম্পা, কারুর বাড়ির আনাচে-কানাচেও কাক দেখা যায় না। কোনও মন্ত্রবলে পাড়ার কাকগুলো সব অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি?

টুকানের আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছিল না। অপমানে গা রিরি করছে। বিস্বাদ মুখে সিঁড়ির দরজায় গেল। নামছে দোতলায়।

তিনটে ধাপও পেরোয়নি, ঘটাং শব্দ। তড়িঘড়ি ফিরে টুকান হাঁ। আরে, এ যে সত্যি একটা সুতোভরতি লাটাই গড়াগড়ি খাচ্ছে ছাদে! ডজনখানেক ঘুড়ির আস্ত বান্ডিলও। এবং কার্নিশে, জলের ট্যাংকের মাথায় সার সার কাক। তাদের মধ্যে কোনটা যে সেই প্রথম কাক, চেনা দায়।

একটা কাক ফটাস ফটাস ডানা ঝাপটাল, 'কী হে, চলবে তো? সবাই মিলে বহুৎ কসরত করে রতনবাবুর কারখানা থেকে তুলে আনলাম।'

পাশেরটি বলে উঠল, 'ওফ, কম কষ্ট! ঠোঁট দুটো টনটন করছে।'

টুকান আহ্লাদে গদগদ। দন্ত বিকশিত করে বলল, 'থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ অল্।'

'হয়েছে, হয়েছে। এবার মনের সুখে ঘুড়ি ওড়াও। শুধু আমাদের কথাটা একটু স্মরণে রেখো, এই যা।'

বলেই টুপটাপ উড়ে যাচ্ছে বায়সকুল। মিনিটখানেকের মধ্যে ছাদ বিলকুল ফাঁকা। টুকানও ঝটপট বেঁধে ফেলল কলকাট্টি। মেপেজুপে। ধরাই দেওয়ার কেউ নেই, একাই টংকা দিয়ে দিয়ে ওঠাচ্ছে ঘুড়ি। নিপুন হাতে সুতো ছেড়ে বাড়ল খানিকটা। একখানা চাঁদিয়াল আকাশ দাপাচ্ছিল এতক্ষণ, টুকানের চৌখুপ্পিকে দেখে সে যেন নড়েচড়ে উঠল। এগোচ্ছে গুটিগুটি। এক্ষুনি প্যাঁচ লড়বে টুকান? চচ্চড়িয়ে টেনে হাওয়া করে দেবে ব্যাটাকে।

সতর্কভাবে চাঁদিয়ালের পাশে চৌখুপ্পিকে নিয়ে গেল টুকান। গোঁৎ খেল একটু। চাঁদিয়াল মহা সেয়ানা, কিছুতেই তলায় ঢুকতে দিচ্ছে না চৌখুপ্পিকে। কাছাকাছি এসেও পিছলে গেল চৌখুপ্পির সীমানা থেকে। টুকান মরিয়া হয়ে আরও কিছুটা সুতো ছাড়ল। খাড়া উঠে গেছে চাঁদিয়ালের মাথায়। এবার হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার। আক্রমণ সে হানবেই।

তোড়জোড় সমাধা করে সবে টুকান চৌখুপ্পিকে আড়াআড়ি টেনেছে, পিঠে হঠাৎ ধাক্কা, 'কী রে, অঙ্ক কষতে কষতে ঘুমিয়ে পড়েছিস যে বড়?'

টুকান ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। মা!

কী কাণ্ড, এতক্ষণ কি তাহলে স্বপ্নে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল?

মা পিঠ থেকে হাতটা সরাননি। আবার একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, 'ওঠ, চান-খাওয়া সেরে নে।'

টুকান চোখ রগড়ে বলল, 'ক'টা বাজে?'

'সাড়ে এগারোটা। খেয়ে ফের অঙ্ক নিয়ে বসবে। যদি দুপুরের মধ্যে পুরো এক্সারসাইজ শেষ না হয়, তাহলে...'

'কী তাহলে?'

'কাল বিশ্বকর্মা পুজোর দিন তোমার ঘুড়ি ওড়ানো বনধ। তোমার বাবা ঘুড়ি-লাটাই আনলেও তুমি হাতে পাবে না।'

মা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ফিক করে হেসে ফেলল টুকান। কাল বিশ্বকর্মা পুজোর দিন মা ঘুড়ি ওড়াতে দেবেন না, এই দুর্ভাবনা থেকেই কি এমন আজগুবি স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ? ইশ, আর একটু দেরিতে ডাকলে দিব্যি চাঁদিয়ালটাকে কেটে দিত সে। থাক, কাল নয় ব্যাটাকে ধরবে।

উঠে দাঁড়িয়ে একটা আড়মোড়া ভাঙল টুকান। প্রফুল্ল মেজাজে স্নানে যাচ্ছে, হঠাৎই দৃষ্টি আটকেছে জানলায়। বাইরে একটা কাক বসে, গ্রিলের ঠিক ওপারটায়। কেমন যেন মিচকে চোখে হাসছে না কাকটা?

ভুরু নাচিয়ে টুকান বলল, 'কী রে, কিছু বলবি?'

কাক ঠোঁট খুলল, 'ক ক কা?'

'হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। তোদের কথা মনে আছে।'

'খা খা খক্।'

'ঘুড়ির বদলে রোজ একটু করে ভাত? বেশ, তাই পাবি।

বলেই টুকান থমকেছে। এবং চমকেছেও কম নয়। এখনও সে পরিষ্কার কাকের ভাষা বুঝতে পারছে। জেগে উঠেও, এ কী করে সম্ভব?

কে জানে, হয়তো বা স্বপ্নেই কাকের ভাষা শিখে ফেলল টুকান!

সরল স্মৃতিধর

হোটেল গোলোকধামের বারান্দায় বসে ছিলেন স্মৃতিধর। গিন্নি গিয়েছেন জগন্নাথদেবের মন্দিরে, আরতি দেখতে। বেরোনোর আগে পইপই করে বলে দিয়েছেন, স্মৃতিধর যেন খবরদার হোটেলের বাইরে পা না বাড়ান। যা ভুলো মানুষ, বেড়াতে এসে কোথায় কখন হারিয়ে যাবেন তার ঠিক আছে!

তা এমন আশঙ্কা তো স্মৃতিধরগিন্নির মনে জাগতেই পারে। স্মৃতিধর সদাসর্বদাই স্মৃতিবিভ্রাটে ভোগেন কিনা! স্কুলে নাইনের বদলে ফাইভের ক্লাসরুমে ঢুকে ত্রিকোণমিতির আঁক কষতে দেওয়ার ঘটনা তো এখন ছাত্রদেরও গা সওয়া। এই যে স্মৃতিধর এবার পুরী এলেন, এও তো ভুল করে আসা। কথা ছিল বড়দিনের ছুটিতে পাটনা যাওয়া হবে। গিন্নির দাদার বাড়িতে। সেই মতো ট্রেনের টিকিটও কাটতে গিয়েছিলেন স্মৃতিধর। কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে পাটনা নামটাই বেমালুম মাথা থেকে হাওয়া, স্মৃতিধর বাড়ি ফিরলেন পুরীর টিকিট হাতে। গিন্নি তো প্রথমে চটে কাঁই, তারপর অবশ্য ঠান্ডা হয়েছেন

ক্রমে ক্রমে। পাটনার বদলে পুরীই বা মন্দ কী! আস্ত একটা সমুদ্র রয়েছে, সকাল-বিকেল জগন্নাথদেবের মন্দিরে যেতে পারবেন...! পাঁচ-সাতটা দিন তো চমৎকার কাটানো যায়।

পুরীতে এসে স্মৃতিধরেরও শরীর মন ভারী ফুরফুরে লাগছে। হোটেলটিও জুটেছে ভালো। স্টেশনে নেমেই কোত্থেকে যেন মাথায় এসে গিয়েছিল গোলোকধাম নামটা। রিকশাওয়ালাকে বলতে সে অবশ্য খানিক গাঁইগুঁই করছিল। কিন্তু শেষমেশ যখন নিয়ে এল, হোটেলটি দেখে স্মৃতিধর মহা আহ্লাদিত। বাড়িটা হয়তো একটু পুরোনো পুরোনো, ঘরগুলোও বেশ স্যাঁতসেঁতে, তবে হোটেলটির অবস্থান অতি উত্তম। মূল শহর থেকে বেশ খানিকটা বাইরে, চতুর্দিক মোটামুটি নির্জন, এমন একটা জায়গায় না উঠলে ক'টা দিন শান্তিতে অঙ্ক কষা যায়!

হ্যাঁ, অঙ্ক আসছেও বটে স্মৃতিধরের মগজে। একের-পর-এক। হোটেলের বারান্দায় এলেই সামনে সমুদ্র, অন্তহীন জলরাশি, অগুনতি ঢেউ। আর সেদিকে চোখ পড়লেই তো রাশি রাশি অঙ্ক ধেয়ে আসতে থাকে। দুপুরে ভরপেট সাঁটিয়ে নিটোল একটি ঘুম দিয়েছিলেন স্মৃতিধর, বিকেলে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই এক নম্বর অঙ্কটি হাজির। এত যে ঢেউ আসছে পাড়ে, এদের কি গোনা হয়েছে কখনও? সারা বছরে কত ঢেউ আসে?

যেই না অঙ্কটা মনে এল, অমনি হাতঘড়ি খুলে চোখের সামনে মেলে ধরেছেন স্মৃতিধর। একবার সেকেন্ডের কাঁটা দেখছেন, পরক্ষণে ঢেউ। কী কাণ্ড, সংখ্যা তো স্থির থাকছে না! প্রতি মিনিটে বদলে বদলে যাচ্ছে! প্রথম মিনিটে ষোলোটা ঢেউ এল, পরের মিনিটে বারোটা, তার পরের মিনিটে চোদ্দোটা...! এরকম হচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে একটা গাণিতিক সম্পর্ক আছে! ঢেউয়ের সংখ্যা আর সময় দিয়ে একটা সমীকরণ তৈরি করা যায় না? সেই সমীকরণের সমাধান করলেই তো সারা বছরে কোন দিন কোন সময়ে কত ঢেউ আসতে পারে তার হিসেব মিলে যায়। দারুণ অঙ্ক! ক্লাসে করতে দিলে বেশ খাবি খাবে ছেলেরা।

ভাবনার মাঝেই বেয়ারা চা দিয়ে গেল। স্মৃতিধরের সমীকরণ যখন মোটামুটি তৈরি, গিন্নিও বেরিয়ে গেলেন। ঠিক তার পর পরই দ্বিতীয় অঙ্কের আবির্ভাব। স্মৃতিধর লক্ষ করলেন, প্রতি মিনিটে যত ঢেউ পাড়ে আসছে, পরের মিনিটে ঠিক তত ঢেউ পাড় থেকে ফিরছে না। আসা-ঢেউয়ের থেকে চলে যাওয়া ঢেউয়ের সংখ্যা সর্বদাই কম। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে কিছু ঢেউ খোওয়া যাচ্ছে। এভাবে যদি ঢেউ হারাতে থাকে, তা হলে কত দিন পরে সমুদ্রে ঢেউয়ের সংখ্যা শূন্য হয়ে যাবে?

এই অঙ্কটা সত্যিই জটিল। সমাধান পেতে পেতে সন্ধে নেমে গেল। পরের অঙ্কের জন্য সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আর

লাভ নেই, অন্ধকারে ঢেউ দেখা যাচ্ছে না। তখনই অন্য এক অঙ্কের আবির্ভাব। স্মৃতিধর টের পেলেন, বেশ কয়েকটা মশা বসেছে হাতে। হূল ফুটিয়ে তারা রক্ত চুষছে মহানন্দে।

স্মৃতিধর সাবধানে মশার সংখ্যা গুনে ফেললেন। ডান হাতে আটটা, বাঁ হাতে এগারোটা। অতএব মোট উনিশটি মশা। এবং প্রত্যেকে যদি স্মৃতিধরের শরীর থেকে পাঁচ মিনিটে এক গ্রাম রক্ত শুষে নেয়, আর স্মৃতিধরের শরীরে যদি মোট তিন কেজি রক্ত থাকে, আবার একই সঙ্গে যদি শরীরে ঘণ্টায় পঁচিশ গ্রাম রক্ত তৈরি হয়, তা হলে এক মাস পর স্মৃতিধরের শরীরে কতটা রক্ত থাকবে?

এমন একখানা প্যাঁচালো অঙ্ক পেয়ে স্মৃতিধর দারুণ পুলকিত। মশার কামড় টেরই পাচ্ছেন না। মস্তিষ্ক নামক কম্পিউটারটিকে চালনা করছেন দ্রুত।

হঠাৎই কানের পাশে পিনপিন শব্দ, 'কঠিন অঙ্ক, তাই না স্যার?'

চমকে ঘাড় ঘোরালেন স্মৃতিধর। আধো অন্ধকারে একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে। মুখখানা স্পষ্ট ঠাহর হয় না। তবু কেমন চেনা চেনা লাগে।

গণনায় ব্যাঘাত ঘটায় স্মৃতিধর সামান্য বিরক্ত। ব্যাজার মুখে বললেন, 'অ্যাই, তুমি কে হে?'

'আমায় চিনতে পারলেন না স্যার? আমি সরল। আপনার

ছাত্র ছিলাম।'

'অ। তাই মনে হল কোথায় যেন দেখেছি। কবে পাশ করেছ বলো তো?'

'এই তো স্যার, গত বছরের আগের বছর,' সরল দাঁত বের করে হাসল, 'আমাকে তো আপনার ভালোভাবেই স্মরণ রাখার কথা।'

'কেন? তুমি কি অঙ্কে লেটার পেয়েছিলে?'

'না স্যার। অঙ্কে তো আমি বরাবরই মাটো ছিলাম। আপনি আমাকে "গোবর সরল" বলে ডাকতেন।'

এতক্ষণে ঠিকঠাক মনে পড়েছে স্মৃতিধরের। এই সরলের মতো অঙ্কে এত নিরেট মাথা শিক্ষকজীবনে স্মৃতিধর বড় একটা দেখেননি। বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি তো দূরস্থান, সামান্য যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করতে গিয়েও ঘেমেনেয়ে একশা হত ছেলেটা। কী করে যে ছেলেটা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে কে জানে?

গম্ভীর মুখে স্মৃতিধর বললেন, 'হুম, এবারে চিনেছি। তা এখন কী করা হয়?'

'কিছুই না স্যার। এদিক-ওদিক ভেসে ভেসে বেড়াই।'

'মানে? পড়াশোনা লাটে?'

'উপায় কী স্যার! আর তো করার জো নেই।'

'কেন?'

'আমি এখন ওসবের বাইরে স্যার।'

অর্থাৎ একেবারেই গোল্লায় গিয়েছে। লেখাপড়া ছেড়ে এখন নিশ্চয়ই টো টো কোম্পানি করে বেড়ায়। খুব খারাপ, খুব খারাপ!

স্মৃতিধর অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'তা এখানে কী মনে করে?

এই হোটেলে?'

'এখানেই তো এখন থাকি স্যার।'

'চাকরি করো বুঝি এই হোটেলে?'

'না স্যার। এমনিই থাকি।'

রীতিমতো বিস্মিত হয়েছেন স্মৃতিধর। চোখ পিটপিট করে বললেন, 'এমনি এমনি থাকো মানে?'

'আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না স্যার। তাই এই হোটেলেই থেকে গিয়েছি।'

'অর্থাৎ এখানকার পার্মানেন্ট বোর্ডার?'

'বলতে পারেন স্যার।'

'আশ্চর্য, সকাল থেকে তো একবারও চোখ পড়েনি! কোন রুমে আছ?'

'সাত নম্বর।'

নম্বরটা ভীষণ পরিচিত লাগল স্মৃতিধরের। কে যেন আছে ওই রুমে? কে যেন...?

'ওটা আপনাদেরই রুম স্যার', সরল ফিক করে হাসল, 'ওখানে আপনারাও আছেন, আমিও আছি।'

এবার সত্যিই বিস্মিত হয়েছেন স্মৃতিধর। বললেন, 'তা কী করে হয়? ঘরে তো তোমার জিনিসপত্র কিছু নেই! রাতে শোবেই বা কোথায়? আলাদা কোনও খাট-বিছানাও তো দেখলাম না!'

'আমার আর ওসব লাগে না স্যার।' সরল লাজুক হাসল, 'আমি তো আর নেই।'

'মানে?'

'বুঝলেন না? মরে গিয়েছি।'

'ও, তাই বলো!' এতক্ষণে বুঝি স্বস্তি পেলেন স্মৃতিধর। হিসেবটাও যেন মিলল। ছেলেটা যদি জীবিতই হত, তা হলে তো তার পক্ষে স্মৃতিধরদের সঙ্গে অবস্থান করাটা সম্ভব হত না। সুতরাং মৃত হওয়াটাই এখানে একমাত্র সমাধান। স্মৃতিধর হাসি হাসি মুখে বললেন, 'তা কবে মারা গিয়েছ?'

'এক বছর তো হবেই। গত বছর এই সময়েই বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে এসেছিলাম। উঠেছিলাম এই হোটেলেই। রুম নম্বর সেভেনে। সমুদ্রে স্নান করতে নেমে অনেকটা ভিতরে চলে যাই, তারপর স্রোতই আমায় টানতে টানতে আরও গভীরে নিয়ে গেল। পারে যখন ফিরলাম, তখন আর বেঁচে নেই। কলকাতার খবরের কাগজে তো নিউজটা বেরিয়েছিল, খেয়াল করেননি?'

ক্ষীণভাবে স্মৃতিধরের মনে পড়ল, স্কুলে একদিন ছেলেটার শোকসভা হয়েছিল বটে! তখনই বোধ হয় শুনেছিলেন হোটেল গোলোকধামের নামটা। তাই হয়তো পুরী স্টেশনে নেমেই...!

স্মৃতিধর দু-চার সেকেন্ড নিরীক্ষণ করলেন সরলকে। তারপর বললেন, 'তা মরে গিয়ে তো ভালোই আছ মনে হচ্ছে?

চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, পড়াশোনা করতে হচ্ছে না, অঙ্ক-টঙ্ক তো ভুলেই মেরে দিয়েছ...?'

'না-না স্যার, অঙ্ক তো এখন আমার হাতের মুঠোয়। অ্যারিথমেটিক, অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি, ট্রিগনোমেট্রি সব এখন জলবৎ তরলং।'

'বটে? বলো তো দেখি, "প্রবৃদ্ধ কোণ" কাকে বলে?'

'একশো আশি ডিগ্রির বেশি, তিনশো ষাট ডিগ্রির কম।'

'কট থার্ট্রি ডিগ্রির ভ্যালু কত?'

'খুব সহজ। রুট থ্রি। বড় গুণ দিন স্যার, মুখে মুখে করে দেব।'

'বেশ। আট হাজার নশো সাতষট্টিকে সাত হাজার তিনশো একুশ দিয়ে গুণ করলে কত হয় বলো দেখি?'

'ছ'কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার চারশো সাত।' প্রশ্ন শেষ হতে না হতে সরলের জবাব উড়ে এল। সঙ্গে অনুযোগ, 'এত ছোট ছোট গুণ দেবেন না স্যার! আর একটু জট পাকিয়ে দিন।'

স্মৃতিধরের জেদ চেপে গেল। পরের পর জটিল অঙ্ক দিচ্ছেন সরলকে এবং কীমাশ্চর্যম, হেলায় করে দিচ্ছে ছেলেটা! টানা আধ ঘণ্টা লড়াই চালানোর পর অবশেষে হার মানলেন স্মৃতিধর। হাঁপাচ্ছেন অল্প অল্প।

সরল হাসছে মিটিমিটি। পিনপিনে স্বর আরও সরু করে

বলল, 'শুধু অঙ্ক নয় স্যার, আমি এখন সবকিছু করতে পারি।'

'যেমন?'

'এই যে আমার এই হাতখানা...যেমন খুশি লম্বা করে দিতে পারি।' বলেই দু-বাহু সমুদ্রের পানে বাড়িয়ে দিয়েছে সরল। হুহু করে এগিয়ে গেল হাত দু-খানা। আঁজলা ভরতি সমুদ্রের জল নিয়ে ফিরেও এল পলকে। স্যারের পায়ে জলটুকু ঢেলে দিয়ে সরল বলল, 'বিশ্বাস হল?'

ভারী মজা পেয়েছেন স্মৃতিধর। বললেন, 'আর কী পারো?'

'আমার মুন্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করে দিতে পারি।' সরল সত্যি সত্যিই মাথাখানা হাতে নিয়ে দেখাচ্ছে স্মৃতিধরকে। অন্ধকারে ছুড়ে দিয়ে লুফল বারকয়েক। আবার লাগিয়ে নিয়েছে যথাস্থানে। গর্বিত স্বরে জিগ্যেস করল, 'আর কিছু দেখতে চান, স্যার?'

মুগ্ধ স্মৃতিধর পরবর্তী ফরমায়েশ পেশ করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই গিন্নির গলা। হোটেলের গেট পেরিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছেন গিন্নি। কাছে এসে সভয়ে বললেন, 'এই ওঠো, ওঠো! এক্ষুনি এই হোটেল ছাড়তে হবে।'

স্মৃতিধর অবাক! দু-হাত উলটে বললেন, 'কেন?'

'মন্দিরে এক বাঙালি ফ্যামিলির সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁরা বললেন, এই হোটেল গোলোকধাম নাকি ডেঞ্জারাস। এখানে নাকি একটা ভূত আছে!'

'জানি তো! আমার ছাত্র!' স্মৃতিধর এদিক-ওদিক তাকালেন। সরলকে দেখতে পেলেন না। অস্ফুটে বললেন, 'এই তো এতক্ষণ আমার সঙ্গেই ছিল...!'

স্মৃতিধরগিন্নির দৃষ্টি বিস্ফারিত। ঢোক গিলে বললেন, 'তুমি তাকে দেখেছ?'

'অবশ্যই! এতক্ষণ ধরে কত কসরত দেখাল...! অঙ্কে কী কাঁচা ছিল ছেলেটা, এখন দারুণ তুখোড়! ও তো আমাদের রুমেই আছে, রাতে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব...!'

বাক্য শেষ হল না। 'আঁ আঁ' একটা আওয়াজ ছাড়লেন স্মৃতিধরগিন্নি, পরক্ষণে কাটা কলাগাছের মতো ধপাস! অজ্ঞান!

স্মৃতিধর হতবাক! কেন যে হঠাৎ ভিরমি খেলেন গিন্নি কে জানে!

বিপিনবিহারীর বিপদ

ছুটির সকাল। বাজার থেকে ফিরে সবে খবরের কাগজটি খুলে বসেছি, অমনই বিপিনবাবু এসে হাজির। ধপাস করে সোফায় বসে বললেন, 'সুখে আছেন মশাই। এদিকে আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল।'

অবাক হলাম একটু। বিপিনবিহারী বটব্যাল একজন নিপাট ভালোমানুষ। পাড়ার কোনও সাতেপাঁচ থাকেন না, বিনা প্রতিবাদে বারোয়ারি পুজোয় চাঁদা দিয়ে দেন, লোকের বিপদে আপদে যেচে সাহায্য করেন, কারও সঙ্গে ঝগড়া নৈব নৈব চ। এমন মানুষের কী বিপদ ঘটল রে বাবা?

ঘাবড়ে যাওয়া মুখে জিগ্যেস করলাম, 'কেন, হল কী?'

'আর বলবেন না, যা ঝকমারিতে পড়েছি...' বিপিনবাবু পা তুলে বাবু হয়ে বসলেন, 'কাল ছিল আমার পেনশন তোলার দিন। সকাল থেকে মেজাজটা ভারী ফুরফুরে হয়ে ছিল। ঘুম থেকে উঠেই ব্যাগ হাতে সোজা চলে গেলাম বাজার। দেখেছেন তো, বাজারটার কী হাল! দু-ফোঁটা বৃষ্টি হল কি হল না, অমনি কাদায় কাদায় ছয়লাপ। তার ওপর

পরশু রাতে এমন জোরে বৃষ্টি নেমেছিল...'

'পড়ে গিয়েছিলেন নাকি কাদায়? চোট পেয়েছেন? আহা-হা, এই বুড়ো বয়সে...'

'না না, পড়ব কেন! আমি মশাই গাঁয়ের ছেলে, কাদায় হাঁটা আমাদের অভ্যেস আছে। জানেন তো আমার দেশ কোথায়? ন্যাজাট। ওখানে আপনাদের শহুরে শৌখিন কাদা নয়, রীতিমতো এঁটেল মাটি। পা একবার কাদায় ঢুকল তো বেরনোর পরে আস্ত কাদার গামবুট। ওই কাদায় কত হাডুডু খেলেছি, ফুটবল পিটিয়েছি, আপনাদের শহরের কাদা আমার কী করবে!'

একটু আশ্বস্ত হয়ে বললাম, 'যাক, আঘাত পাননি তা হলে?'

'প্রশ্নই ওঠে না।' পকেট থেকে ডিবে বের করে বিপিনবাবু নস্যি নিলেন এক টিপ, 'তা কাদা মাড়িয়ে ঢুকলাম তো মাছের বাজারে। ঢুকেই ভিরমি খাওয়ার জোগাড়।'

'কেন? কেন? কী দেখলেন সেখানে?'

'ইয়া বড় বড় ইলিশ! আহা, কী তাদের রং, কী রূপ! গায়ে যেন রুপো ঝিলিক কাটছে। জিগ্যেস করলাম, কোথাকার মাছ ভাই? বলল, কোলাঘাটের। এমন মাছ আর এ বছরে আসেনি বাবু। নিয়ে যান, ঠকবেন না। ব্যাস, অমনি লোভে পড়ে গেলাম। কিনে ফেললাম একখানা দেড় কেজির ইলিশ!'

'বুঝেছি। ওই ইলিশই কেলেঙ্কারি ঘটিয়েছে। মাছ পচা বেরোল তো?'

'দূর মশাই, বিপিন বটব্যালকে মাছে ঠকাবে! আমার হল গিয়ে জহুরির চোখ। কানকো দেখে বলে দেব সে মাছ কখন জালে পড়েছে।'

'তা হলে? বউদি কি ইলিশ মাছ পছন্দ করেন না?'

'বলেন কী মশাই! সে তো ইলিশ তোলা তোলা করে খায়। সে কাঁটাচচ্চড়ি খাবে বলে পুঁইশাক আনলাম, সঙ্গে কুমড়ো-বেগুন-ঝিঙে, বাজার ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে অসময়ের মুলো...'

'বাহ্, এ তো ভালো ব্যাপার। এতে ঝকমারিটা কোথায়? রান্নাটা বুঝি জুতের হয়নি?'

'আমার গিন্নির হাতের রান্না তো খাননি...অমৃত মশাই, অমৃত। অমন উত্তম ইলিশভাপা একবার খেলে মৃত্যু পর্যন্ত জিভে লেগে থাকবে। নিজেকে সামলাতে পারলাম না মশাই, লোভে পড়ে একটার জায়গায় তিন পিস খেয়ে ফেললাম।'

'ও, মাছ খেয়েই তবে সর্বনাশ? বুক আইঢাই? অম্বল? বদহজম?'

'আজ্ঞে না সার। ওসব মিনমিনে রোগ হবে আজকালকার ছেলেছোকরাদের। যারা ব্রয়লার মুরগি, কাটা পোনা ছাড়া কিছু খেতে শেখেনি। আগে আগে তো নেমন্তন্ন বাড়িতে আমার খাওয়া দেখতে ভিড় জমে যেত। একবার ছেষট্টি পিস

মাছ খেয়েছিলাম বিয়েবাড়িতে। সঙ্গে পঁচাশিটা রসগোল্লা। রস চিপে নুন মাখিয়ে নয়, রসসুদ্ধু।' বলতে বলতে বিপিনবাবুর চোখ জ্বলজ্বল, 'শরীরের জোশ এখনও যায়নি মশাই। এখনও লোহা চিবিয়ে হজম করতে পারি।'

আমার ধন্দ লেগে যাচ্ছিল। এমন মহান শক্তিসম্পন্ন লোকের বিপদ তাহলে এল কোথেকে? মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'তা সর্বনাশটা কী?'

'সেটা বলতেই তো আসা।' বিপিনবাবু নড়ে বসলেন, 'তারপর তো বুঝলেন, খেয়েদেয়ে তো বেরোলাম। ছাতাটি বগলে নিয়ে। মোড়ে গিয়ে পান খেলাম একটা। পান অবশ্য রোজ খাই না। যেদিন আহারটি উত্তম হয়, সেদিন আমার পান একটা চাই-ই। মিষ্টি পান। তাতে গদগদে করে গুলকান্দ দেওয়া থাকবে, খাবলা করে চমনবাহার। এবং পাতাটিও হবে মিঠে।'

লোকটার এই দোষ। বড্ড বেশি বকে। কিছুতেই মূল প্রসঙ্গে আসতে চায় না। অধৈর্যভাবে বললাম, 'নিশ্চয়ই পান থেকে আপনার কোনও বিপত্তি হয়নি?'

আমার কথার বাঁকা সুরটি টের পেয়েছেন বিপিনবাবু। হেসে বললেন, 'চটেন কেন, শুনুনই না! পানের পিকটি ফেলে বাসস্টপে এসে দাঁড়িয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে বাস। উঠলাম তো বাসে, আর তখনই...'

'গা গুলিয়ে উঠল?'

'বললাম তো আপনাকে, আমি সেই ধাতুতেই গড়া নই। ভরপেট খেয়ে কতবার নাগরদোলায় চড়েছি, একটি দিনের তরেও গা গুলোয়নি।'

'তা হলে হলটা কী? পকেটমার ছিনতাইবাজের পাল্লায় পড়লেন?'

'উঁহু। ছেলেবেলার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। হরিসাধন। একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম আমরা। হরিসাধনটা ছিল বেজায় ডানপিটে। স্কুলের পেছনে একটা নারকোলগাছ ছিল। টিফিনের সময়ে গাছটায় তরতর উঠে গিয়ে ডাব পেড়ে আনত। যাদের গাছ তাদের সঙ্গে এই নিয়ে যে কত ঝামেলা হয়েছে! একবার তো তারা হেডস্যারের কাছে কমপ্লেন ঠুকে দিল। আমাদের হেডস্যার ছিলেন বেজায় কড়া। তাঁর দাপট কী ছিল, বাপ্‌স! একবার চোখ লাল করে তাকালে আমরা ভয়ে শুকিয়ে যেতাম। সেই হেডস্যার গুনে গুনে পঁচিশ বেত লাগিয়েছিলেন হরিসাধনকে। বেচারার হাতের চেটো ফুলে ঢোল, অথচ বাড়িতে বলতেও পারছে না, প্রহারের কারণ শুনলে তাঁরাও ছেলেকে উত্তমমধ্যম দেবেন...। বাজারে একটা বরফের দোকান ছিল, সেখান থেকে বরফ এনে রুমালে বেঁধে পুলটিশ লাগানো হল হরিসাধনের হাতে। তাতেও কি হরিসাধনের দৌরাত্ম্য কমেছিল? একটুও না। একদিন তো নিজেরই বাড়ির

আমগাছ থেকে আম চুরি করতে গিয়েছিল...। হরিসাধনদের ওই আমগাছখানায় কী ভালো আম যে হত! খিরসাপাতি। কী মিষ্টি, কী মিষ্টি! আপনাকে যে কী করে বোঝাই! ওই আম মুখে দিলে টের পাওয়া যায় কেন আমকে রসাল বলে।'

মেন লাইন ছেড়ে কর্ড লাইনে চলেছেন বিপিনবিহারী। বাধ্য হয়ে গলাখাঁকারি দিতে হল, 'তা সেই হরিসাধনবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুবাদেই কি...?'

'ছিছি!' বিপিনবাবু এক হাত জিভ কাটলেন, 'পুরোনো বন্ধু কখনও বিপদে ফেলতে পারে? তাও আবার হরিসাধনের মতো বন্ধু? যেমন ডাকাবুকো, তেমনই বন্ধুবৎসল। কতবার যে বন্ধুদের জন্য ও মারপিট করেছে।'

'কাল নিশ্চয়ই ওঁকে তেমনটি করতে হয়নি? অতিকষ্টে থামালাম বিপিনবিহারীকে।

'না না, মারামারি করার বয়স আর আমাদের কোথায়!' বিপিনবাবু লজ্জা পেলেন, 'তবে হরিসাধন এখনও দিব্যি তাগড়াই আছে। পুলিশে চাকরি করত তো! ঢুকেছিল এ-এস-আই হয়ে, রিটায়ার করেছে ডি-এস-পি পোস্ট থেকে। বেশ অনেকটাই উঠেছিল, কী বলেন?'

'তবে তার সঙ্গে আপনার সর্বনাশের কোনও সম্পর্ক আছে বলে তো মনে হয় না।'

'নেইই তো।' বিদ্রূপের খোঁচাটা হজম করে নিলেন

বিপিনবিহারী। এতটুকু অপ্রতিভ না হয়ে বললেন, 'তবে কী জানেন, হরিসাধন আমায় অবাক করে দিয়েছে।'

'কীরকম?'

'আমি যে ব্যাঙ্ক থেকে পেনশন তুলি, ওরও পেনশন সেই ব্যাঙ্কেই। হরিসাধনও তিন বছর হল রিটায়ার করেছে, আমিও তাই। অথচ আমাদের দুজনের মধ্যে একবারও দেখা হয়নি। একই রুটের বাসে যাই, সেখানেও না। এই নিয়ে আমরা দুজনে জোর একচোট হাসাহাসি করলাম।'

'তারপর?'

'তারপর বাস থেকে নেমে দুজনেই গুটিগুটি পায়ে ব্যাঙ্কে।'

'তখনই বুঝি কিছু ঘটল? মানে কোনও ফ্যাসাদে পড়লেন?'

'ব্যাঙ্কে আবার কীসের ফ্যাসাদ। মাঝে মাঝে আমাদের মতো পেনশনারদের লাইনটা বড্ড বড় হয়ে যায়, এই যা! তা আমি তো খেয়েদেয়েই বেরোই, বাড়ি ফেরার কোনও তাড়া থাকে না, আমার অসুবিধেই বা কীসের! আর কাল তো কপাল গুণে কাউন্টার ফাঁকাই ছিল। দুজনেই টাকা পকেটস্থ করলাম, তারপর গিয়ে বসলাম কার্জন পার্কে। বোঝেনই তো, এতকাল পরে দেখা...কতকাল পর জানেন? পাক্কা চল্লিশ বছর। শেষ যখন দেখা হয়েছিল তখন ও বি-এ পরীক্ষায় গাড্ডু মেরে ফ্যাফ্যা করে বেড়াচ্ছে, আর আমি

সবে রেলের চাকরিতে ঢুকেছি। অ্যাদ্দিনের জমা কথা কি সহজে ফুরোয়? হরিসাধন ওর পুলিশজীবনের এককাঁড়ি রোমহর্ষক কাহিনি শোনাল, আমিও আমার অফিসের গালগপ্পো করলাম। আড্ডা মারতে মারতে কখন বিকেল চারটে।

হরিসাধন বলল, চলো অনেকদিন ডেকার্স লেনের ঘুগনি খাইনি, আজ জম্পেশ করে ঘুগনি আলুর দম সাঁটাই। আমার তখনও পেট গজগজ, তবু জিভটা কেমন শুলিয়ে উঠল। ডেকার্স লেনের ঘুগনি জানেন তো? দারুণ ফেমাস। পাতলাও নয়, ঘনও নয়, মটর শক্তও নয়, গলা গলাও নয়, ঝালমশলা একেবারে মাপা। শাস্ত্রে বলেছে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। শাস্ত্রবচন উপেক্ষা করে নিয়েই নিলাম এক প্লেট। সেটা সাবাড় করেও থামতে পারলাম না, ফের এক প্লেট নিলাম!'

'বুঝেছি। সেই ঘুগনি খেয়েই পেটখারাপ? সকাল থেকে ক'বার গেলেন বাথরুমে?'

'ধুস্, বললাম না আপনাকে, আমার কখনও পেটের অসুখ হয় না। সামান্য দু-প্লেট ঘুগনি আমার কী করবে?'

'ও!' হতাশ গলায় বললাম, 'তা হলে?'

'তা হলে আর কী! আমি আর হরিসাধন ঘুগনি সাঁটিয়ে উঠে পড়লাম। ও গেল মেয়ের বাড়ি শ্যামবাজার, আর আমি উঠলাম ফিরতি বাসে। তখন সবে ছুটি হয়েছে, বাসে রীতিমতো ভিড়। কোনওরকমে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়েছি, পকেটে পেনশনের টাকা...আমরা মতো রিটায়ার্ড মানুষের সারা মাসের সম্বল...'

'হায় হায়, টাকাটাই গেল তো?' খাড়া হয়ে বসলাম, 'পিকপকেট?'

'মাথাখারাপ! পকেট মারবে? আমার? সারাক্ষণ পকেটে হাতচেপে দাঁড়িয়ে, বাছাধনদের সাধ্য কী আঙুল গলায়? তবে যাই বলুন, এক বগলে ছাতা ধরে অন্য হাতে পকেট সামলানো কি মুখের কথা? মনে মনে তখন খুব রাগ হচ্ছিল, কেন যে ছাতা নিয়ে বেরোলাম! বলতে পারেন, প্রিয় ছাতাটাকে অভিশাপই দিচ্ছিলাম বেশ।'

'সেই প্রিয় ছাতাই বুঝি গেল শেষে?'

'ঠিক উলটো। ছাতাই বরং কাজে লেগে গেল। বাস থেকে নামার পর পরই...ঝেঁপে বৃষ্টি এল না কাল? হল মাত্র দশ মিনিট, কিন্তু আর কী ভয়ঙ্কর তোড় ছিল বলুন? পেট আমার পোক্ত বটে, তবে ফুসফুস দুটি তো ঝরঝরে। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়লেই শুরু হয়ে যায় সর্দিকাশি। দ্যাখ না দ্যাখ, শয্যা নিতে হয়। ওই ছাতার কল্যাণেই কাল বেঁচে গেলাম বলা যায়। টাকাটাও ভিজল না।'

'বাহ্, এ যে দেখি সবই ভালো ভালো ঘটনা।'

'ছাই ভালো। বাড়ি ফিরে কী দেখি জানেন? গিন্নি অন্ধকারে বসে। মুখ কালো করে।'

'কেন? কেন? আপনার দেরি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন বুঝি?'

'হুঁহ্, আমার জন্য উদ্বেগ! সেই কপাল কি করেছি মশাই? ফিউজ উড়ে গিয়েছিল। মেন মিটার থেকে। ভাবুন, এই

গরমে যদি কারেন্ট না থাকে...! ইলেকট্রিক মিস্ত্রিদের তো জানেন। ভগবানকে পাওয়া সহজ, কিন্তু তাদের দর্শন মেলা ভার।'

'ও। তার মানে সারারাত কাল ঘুমোতে পারেননি? সেদ্ধ হয়েছেন গরমে?'

'তাই হতাম। যদি নিজে ইলেকট্রিকের কাজ না জানতাম। ওইসব টুকটাক কাজের জন্য আমি মেকানিকের পরোয়া করি না মশাই। এই তো গত হপ্তায় আমার জলের কলটা খারাপ হয়ে গেল, আমি থোড়াই প্লাম্বারের পেছনে দৌড়েছি! আমার মশাই আপনা হাত জগন্নাথ। সোজা চলে গেলাম ওয়েলিংটন। কল কিনলাম, পাইপ কিনলাম...। ভাবতে পারবেন না মশাই, ওখানে পাইপ কল সব কী সস্তা। বিশেষ করে চাঁদনি মার্কেটের দিকটায়। এখানে যে জিনিসের জন্য একশো টাকা হাঁকে, ওখানে তার দাম মেরে-কেটে ষাট। মিস্ত্রিও কলে হাত দিলে না হোক নিত পঞ্চাশ-ষাট টাকা। তা হলে কতগুলো টাকা বেঁচে গেল বলুন? তবে কাল ওই অন্ধকারে ফিউজ সারাতে গিয়ে...'

'আহা-হা, কারেন্ট খেয়েছেন বুঝি?'

'না মশাই, না। মনের মতো তার খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর হঠাৎই মনে পড়ল, আছে তো তার, বাথরুমের লফ্‌টে পুরোনো তার প্লাস্টিকে মুড়ে রাখা আছে। সঙ্গে সঙ্গে

ওই অন্ধকারেই অ্যালুমিনিয়ামের ঘড়াঞ্চিতে চড়ে হাতড়ে হাতড়ে বের করলাম তার। তারপর ফিউজ লাগানো তো দু-মিনিটের কাজ। তবে হ্যাঁ, ফিউজের তার লাগাতে হয় খুব মেপেজুপে। বেশি মোটা হলে মেন উড়ে যাবে, বেশি সরু হলে নিজেই ঘন ঘন জ্বলবে। অবশ্য আমার হাত যথেষ্ট পাকা। একবার যদি ফিউজটি লাগাই, ছ'-আট মাস নিশ্চিন্তে।'

ওরে বাবা, এ যে দেখি রুশি সৈনিক! রোদে পোড়ে না, জলে ভেজে না, আগুনে ঝলসায় না, কারেন্ট খায় না...জাগতিক সমস্ত বিপদই তো টপকে টপকে চলে যায়। এমন মানুষের তাহলে আর কী বিপদ ঘটা সম্ভব? নতুন করে আর প্রশ্ন করতেও সাহস হচ্ছে না। কোন কথা থেকে বিপিনবাবু কোন কথায় চলে যাবেন ঠাহর করা দায়!

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'সর্বনাশের কথা পরে হবে, এখন একটু চা খাবেন তো?'

'চা?' বিপিনবিহারীর প্রৌঢ় মুখখানি সহসা খুশিতে উদ্ভাসিত, 'অবশ্যই। অবশ্যই। আরে, ওই সর্বনাশের কথাই তো আপনাকে বলতে এসেছি মশাই।'

'মানে?'

'কাল রাত্তিরে তারপর ছেলে এসেছিল। কথা নেই, বার্তা নেই, দুম করে দু-দিনের জন্য মাকে নিয়ে চলে গেল। নিজের ফ্ল্যাটে। আপনার বউদিও হয়েছেন তেমনই। নাতি-নাতনির

সঙ্গে মৌজ করবেন বলে তিনিও ড্যাং ড্যাং করে ছুটলেন। আমার রান্নার মেয়েটি আসবে সেই বেলা দশটায়। এদিকে... হেঁহেঁ...বুঝলেন কিনা...আমি গ্যাসটাও জ্বালতে পারি না। বলুন, এটা কি আতান্তর নয়? সকালের নেশার চা-টা কি আমি রাস্তায় গিয়ে খাব?'

যাক, শেষ পর্যন্ত তা হলে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরোল! ঠিকই তো, এতবড় বিপদ কারও ঘটে নাকি?

হাসিমুখে বললাম, 'সামান্য চা খাবেন এ আর এমন কী? আগে বললেই পারতেন!'

'কী করে বলব? আপনি বলার সুযোগ দিচ্ছেন? তখন থেকে একের পর এক গপ্পো জুড়ে জুড়ে...। ওফ্, মাথাটা আমার ধরে গেল মশাই। সক্কালবেলা কী করে যে এত বকবক করতে পারেন! একটা সোজা কথা সোজাভাবে বলব, তারও উপায় নেই?'

হক কথা। ধান ভানতে কে এতক্ষণ শিবের গীত গাইছিল? আমিই তো!

ছোট্ট ভুল

ভুলে যাওয়ার বিদ্‌ঘুটে বদ অভ্যাসটি থেকে ইদানীং মুক্তি পেয়েছেন স্মৃতিধরবাবু। অবশ্য এমনি এমনি নয়, ডাক্তারের ওষুধ খেয়েও নয়। উন্নতিটা ঘটেছে তাঁর গিন্নির এক সুচারু বন্দোবস্তে। দারুণ একখানা কল বার করেছেন স্মৃতিধরবাবুর স্ত্রী। একটা ক্যাসেটে রোজ রেকর্ড করে দেন স্মৃতিধরের সারাদিনের কাজের তালিকা। তারপর ক্যাসেটটিকে ওয়াকম্যানে পুরে চালান করে দেওয়া হয় তাঁর জামার পকেটে। আর একটি স্পিকার লাগানো থাকে স্মৃতিধরবাবুর কানে। ক্যাসেট চালিয়ে শুনে নিলেই হল। কখন কী করতে হবে, মনে পড়ে যাবে পরপর।

যেমন আজই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওয়াকম্যান চালু করতেই বেজে উঠল প্রথম নির্দেশ। বাঁয়ে সাতানব্বই পা হাঁটো, রিকশাস্ট্যান্ড পড়বে। রিকশায় চড়ে বলবে, পরেশ মেমোরিয়াল হাই স্কুলে যাব। ভাড়া দেবে পাঁচ টাকা। সেই মতোই রিকশায় উঠে বসলেন স্মৃতিধরবাবু। দিব্যি হাওয়া খেতে খেতে যাচ্ছেন স্কুলে। গিন্নি এই রিকশার ব্যবস্থাটি করায় দু-দুটো লাভ হয়েছে

তাঁর। প্রথমত, সাইকেলে চাপার জটিল সমস্যাটি আর নেই। কোনটা বাঁ প্যাডেল, কোনটা ডান প্যাডেল, কোন প্যাডেলে পা রেখে সিটে বসতে হবে, তাঁকে এইসব খটোমটো হিসেব আর কষতে হচ্ছে না। দু-নম্বর সুবিধে, স্কুলের বদলে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার ভয় নেই। এই তো সেদিনই স্কুল ভেবে হাসপাতালে ঢুকে পড়েছিলেন। ক্লাসরুম খুঁজে পেতে সে কী আতান্তর। ছাত্ররা সব ডেস্ক বেঞ্চির বদলে সার দিয়ে বেডে শুয়ে...! ডাক্তার নার্সরা ভুল ধরিয়ে না দিলে কী যে হত সেদিন! তা ওই ঝকমারি আর নেই এখন। স্কুলে যেতে পাঁচ, ফিরতে পাঁচ, মাত্র দশ টাকায় কী তোফা মুশকিল আসান।

আর স্কুলে একবার পৌঁছে গেলে স্মৃতিধরবাবুকে তখন পায় কে! ওয়াকম্যান চালানোর তো প্রয়োজনই নেই। রুটিন দেখে দেখে পরপর শুধু ক্লাস নাও, ব্যাস। মাঝে একবারই শুধু যন্ত্রটাকে দরকার। টিফিনের সময়ে। স্মরণ করিয়ে না দিলে স্মৃতিধরবাবু জানবেন কী করে আজ তিনি টিফিন এনেছেন, না আনাতে হবে।

যাই হোক, আজ ক্লাস-টলাসগুলো শান্তিতেই চুকে গেল। নাইনের ছেলেদের দু-দুখানা বুদ্ধির অঙ্ক দিতে পেরে মনটা বেশ খুশি খুশিও রয়েছে। একটা সুদ কষা, আর একটা ঐকিক নিয়ম। একটা লোক যদি শতকরা দু-টাকা হারে হাজার টাকা ধার নিয়ে প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে শোধ দেয়, এবং প্রতি

তিন মাস পরপর একবার করে টাকা শোধ করতে ভুলে যায়, তাহলে সাকুল্যে কত মাস পরে তার সমস্ত টাকা শোধ হবে। এই অঙ্কটার তুলনায় দ্বিতীয়টা একটু বেশি প্যাঁচালো। ছাব্বিশটা পিঁপড়ে একটা চিনির বয়াম উনিশ মাসে খালি করে। প্রতি মাসে যদি দুটো করে পিঁপড়ে মারা যায়, আর দু-মাস অন্তর একটি করে পিঁপড়ে এসে দলে যোগ দেয়, তাহলে কত দিন পর বয়ামের চিনি পুরোপুরি সাবাড় হবে। ছেলেগুলো অঙ্ক দুটো পেয়ে মাথা চুলকোতে শুরু করেছিল, দেখে ভারী আনন্দ হয়েছে স্মৃতিধরের। এইসব অঙ্কের সমাধান করেই তো ছাত্রদের মগজ সাফ হবে, নয় কী?

ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেছে। স্মৃতিধর এবার বেরোনোর তোড়জোড় করছিলেন। গিয়ে এখন রিকশায় ওঠাটাই তাঁর কাজ, তবু কী ভেবে যেন চালালেন ওয়াকম্যানটা। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নির গলা। স্কুল থেকে সোজা হেলাবটতলা ক্লাবে যাবে। সেখানে তোমার একটা সম্বর্ধনা আছে। স্কুলগেট থেকে বেরিয়ে রিকশা নাও। ভাড়া পড়বে চার টাকা।

শুনেই মগজে কিলবিল করে উঠেছে স্মৃতি। হ্যাঁ, তাই তো, পরশু সন্ধেয় জনাচারেক ছেলে এসেছিল বাড়িতে। হেলাবটতলা ক্লাবের সদস্যদের পক্ষ থেকে। অঙ্কে অসামান্য প্রতিভার জন্য তারা এবার মরীচিকা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করতে চায় স্মৃতিধরবাবুকে। এসে নিয়ে যেতেই চেয়েছিল তারা। স্কুল

থেকে। স্মৃতিধরই বলেছেন, অত হ্যাপার প্রয়োজন নেই, তিনি নিজেই চলে যাবেন। ভাগ্যিস ওয়াকম্যানটা ছিল, নইলে অনুষ্ঠানটার কথা তো ভুলেই মেরে দিতেন।

মনে মনে গিন্নিকে ফের একবার তারিফ জানিয়ে রিকশা ধরলেন স্মৃতিধর। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পৌঁছে গেছেন হেলাবটতলা।

ক্লাবের সভ্যরা স্মৃতিধরবাবুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। ছুটে এসেছে, 'আসুন স্যার। আসুন স্যার।'

রিকশা থেকে নামতে নামতে প্রফুল্ল মুখে স্মৃতিধর বললেন, 'আমার দেরি হয়নি তো?'

'একটুও না। আপনি যে এত পাংচুয়ালি আসবেন, ভাবতেই পারিনি।'

'এই সময় নিয়ে আমার একটা অঙ্ক আছে, বুঝলে।...একটা লোক তেরো মিনিটে এক মাইল রাস্তা হাঁটতে পারে। একদিন সে দুশো গজ গিয়ে...'

আর এগোতে পারলেন না স্মৃতিধর। উদ্যোক্তা ছেলেগুলো হাঁহাঁ করে উঠেছে, 'অঙ্কটা পরে হবে স্যার। আপনি আগে ভেতরে চলুন।'

স্মৃতিধর বড়সড়ো ক্লাবঘরটার অন্দরে ঢুকলেন। সভ্যদের অধিকাংশই তাঁর প্রাক্তন ছাত্র। এসে তারা প্রণাম করে যাচ্ছে টিপটিপ। সবক'টা মুখকেই ভীষণ চেনা চেনা লাগে, তবু

কাউকেই ঠিক পুরো চিনে উঠতে পারছেন না। নাম-ধাম, স্কুল থেকে পাশ করার বছর শুনে মনে পড়ছে একটু একটু, আবার গুলিয়েও যাচ্ছে।

স্মৃতিধর অবশ্য ছেলেগুলোকে নিয়ে বেশি ভাবার অবকাশ পেলেন না। হলের এক ধারে ছোট্ট মঞ্চ প্রস্তুত, সেখানে ওঠার জন্য ডাকাডাকি করছে উদ্যোক্তারা। মধ্যিখানের গদি আঁটা চেয়ারে স্মৃতিধর বসলেন গ্যাঁট হয়ে। পাশে ক্লাবের সভাপতি পাঁচকড়ি তলাপাত্র। নামটার মধ্যে একটা অঙ্ক অঙ্ক গন্ধ আছে বলে লোকটাকে ভারী পছন্দ হয়ে গেল স্মৃতিধরের। নিজেই যেচে আলাপ জমিয়েছেন। হাসি হাসি মুখে জিগ্যেস করলেন, 'পাঁচকড়িবাবু কি এখানেই থাকেন?'

'হ্যাঁ মাস্টারমশাই।' পাঁচকড়ি বিনয়ে গদগদ, 'আমি এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।'

'বাহ্, বাহ্। তা আপনার ছেলেপুলে ক'টি?'

'দুই ছেলে। দুজনেই আপনার স্কুলে আছে।'

'তাই নাকি? কী নাম বলুন তো?'

'তিনকড়ি। আর এককড়ি।'

শুনে বড় প্রীত হলেন স্মৃতিধর। পাঁচকড়িবাবু তো বেশ অঙ্ক মেনে চলেন! নাম ধারাবাহিক ভাবে দুই দুই করে কমেছে। কিন্তু এরপর আর একটি পুত্র হলে কী করবেন পাঁচকড়ি? এককড়ি থেকে দুই কমলে তো মাইনাস এক। তাহলে কি

মাইনাস এককড়ি? কেমন শ্রুতিকটু লাগবে না?

ভাবনাটা নিয়ে খেলতে পারলেন না স্মৃতিধর, অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁদের বরণ করল একটি বাচ্চা

মেয়ে। তারপরই উদ্বোধনী সংগীত। শেষ হতে না হতেই সভাপতির ভাষণ। গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে জব্বর একটা বক্তৃতা দিলেন পাঁচকড়ি তলাপাত্র। অঙ্কের প্রতি স্মৃতিধরবাবুর নিষ্ঠা, ছাত্রদের অঙ্ক শেখানোর জন্য স্মৃতিধরবাবু কতটা যত্নবান, তাঁর প্রেরণায় পরেশ মেমোরিয়ালে ছেলেরা অঙ্কে কত উন্নতি করেছে, এসব নিয়ে ঝাড়া এক ঘণ্টা ভাষণ দিলেন।

প্রশংসার বহরে স্মৃতিধরের বুক গর্বে ফুল উঠছিল। পাঁচকড়ি থামতেই এবার তাঁর পালা। আবেগে গলা বুজে আসছে, তবু মোটামুটি গুছিয়েই বললেন জীবনে অঙ্কের কত দাম। অঙ্ক করলে স্মৃতিশক্তি কেমন চড়চড়িয়ে বাড়ে, অঙ্ক দিয়ে কতরকম সমস্যার মীমাংসা করে ফেলা যায়, বোঝালেন সবিস্তারে। যেমন, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে জ্যামিতির উপপাদ্য ধরে এগোনো উচিত, তাতে পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়। এমনকী দোকান-বাজারে গিয়েও যদি বীজগণিতের ফরমুলা প্রয়োগ করা যায়, তাহলে বেশ খানিক পয়সা বাঁচে। আর পাটিগণিত তো জীবনের প্রতিটি পদেই কাজে লাগছে। সে বাগান করাই হোক, কি বাড়ি বানানো। সবই তো পাটিগণিতের হিসেব।

স্মৃতিধরের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। কেউই প্রায় কিছুই বোঝেনি, কিন্তু শেষ হতেই বিপুল করতালি।

এবার পুরস্কার বিতরণ। হেলাবটতলা ক্লাবের পক্ষ থেকে

সোনার জল করা মরীচিকা মেডেলটি পাঁচকড়িবাবুই ঝুলিয়ে দিলেন সকলের প্রিয় মাস্টারমশাইয়ের গলায়। সঙ্গে এক সেট ধুতি-পাঞ্জাবি, প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি রসগোল্লা, আর একটি ওজনদার মানপত্র। স্মৃতিধর আহ্লাদে ডগমগ। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেও চেয়ার ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছে না। মরীচিকা পুরস্কার প্রাপ্তির আনন্দে বুঁদ হয়ে বসে আছেন। ভুলো মন বলে সারাটা জীবন তো শুধু ঠাট্টা তামাশাই ছুটল। গিন্নিও তাঁকে ছেড়ে কথা বলেন না। আজ এই পুরস্কার নির্ঘাত তাঁর সব বদনাম ঘুচিয়ে দেবে।

একটি অল্পবয়সি ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। বয়স মেরেকেটে উনিশ কুড়ি। চোখ নাচিয়ে ছেলেটা বলল, 'এবার উঠতে হবে তো।'

ভীষণ পরিচিত মুখ, নিশ্চয়ই কোনও প্রাক্তন ছাত্র। এবং এই ক্লাবেরই সভ্য। স্মৃতিধর ঘাড় নাড়লেন, 'হ্যাঁ, এবার তো বাড়ি যেতে হয়।'

'চলো তাহলে, মানপত্রটা আমার হাতে দাও।'

স্মৃতিধর খুশিই হলেন। এতগুলো জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর কম্মো নয়। ছেলেটা যদি একটু সাহায্য করে দেয় তো ভালোই।

মানপত্রটা ছেলেটাকে ধরিয়ে দিয়ে হাঁড়ি আর ধুতিপাঞ্জাবির প্যাকেট হাতে ঝুলিয়ে বাইরে এলেন স্মৃতিধর। কীভাবে বাড়ি ফিরবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। ছেলেটা সঙ্গে যাবে বোঝাই

যাচ্ছে, কিন্তু রিকশা ধরবেন কি? গিন্নি এ ব্যাপারে কী বলেছেন? ওয়াকম্যানটা চালিয়ে শুনে নেবেন?

যন্ত্রের সুইচ টেপার আগেই ছেলেটির গলা, 'রিকশা-টিকশার দরকার নেই, কী বলো? এইটুকু পথ, চলো হেঁটেই মেরে দিই।'

এবার যেন কেমন কেমন লাগল স্মৃতিধরবাবুর। ছেলেটা মহা পাকা তো, অবলীলায় মাস্টারমশাইকে 'তুমি তুমি' করছে!

মুখে অবশ্য বিরক্তিটা প্রকাশ করলেন না স্মৃতিধর। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তাই চলো তবে।'

স্মৃতিধর হাঁটা শুরু করেছেন। ছেলেটাও চলেছে পাশে পাশে। বিশ-তিরিশ পা গিয়ে ছেলেটা বলল, 'হাঁড়িটা বইতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?'

গোমড়া গলায় স্মৃতিধর বললেন, 'হুম্।'

'তাহলে আমাকে দাও। আমি নিচ্ছি।'

হাঁড়ি হস্তান্তর করে হালকা হয়েছেন স্মৃতিধর। আড়ে আড়ে দেখছেন ছেলেটাকে। স্মরণে আনার চেষ্টা করছেন ছেলেটার নাম। বছরতিনেক আগে গোকুল বলে ক্লাস টেনের একটা ছেলে তাঁকে খুব জ্বালাত। সে নয় তো? কিংবা তার আগের ব্যাচের হলধর? বোর্ডে যেই অঙ্ক লিখতে যেতেন স্মৃতিধর, ওমনি গোকুলের গলায় বেজে উঠত ব্যাঙের ডাক। হলধর তবলা বাজাত পিছনের বেঞ্চে বসে। কিন্তু ওই ছেলে দুটোর

কি মাস্টারমশাইকে তুমি তুমি করার স্পর্ধা হবে?

ভাবতে ভাবতে পঞ্চাশ পা-ও এগোননি স্মৃতিধর, ফের ছেলেটার প্রশ্ন 'হাতের প্যাকেটটাও নিয়ে নিলে কি তোমার সুবিধে হবে?'

স্মৃতিধর ভুরু কুঁচকে তাকালেন, 'কেন বলো তো?'

'বা রে, শুধু একটা ঝোলা কাঁধে হাঁটাই তো তোমার অভ্যেস। দাও, প্যাকেটটাও আমার হাতে দাও।'

এমন কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুরে ছেলেটা বলল, স্মৃতিধরের মুখ দিয়ে না বেরোল না। স্মৃতিধরের ধুতিপাঞ্জাবি হস্তগত করে ছেলেটা এবার সামনে সামনে হাঁটছে। দুলে দুলে। ওই হাঁটার ভঙ্গিটাও স্মৃতিধরের চেনা। কোথায় যে দেখেছেন? স্কুলেই? নাকি পাড়ায়? কিংবা বাজারে?

খানিক দূর গিয়ে ছেলেটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। চোখ পিটপিট করে দেখছে স্মৃতিধরকে। ঠোঁটে মুচকি মুচকি হাসি।

রীতিমতো অপ্রসন্ন হলেন স্মৃতিধর। গুমগুমে গলায় বললেন, 'ব্যাপারখানা কী, অ্যাঁ? হঠাৎ দাঁত বের করেছ যে বড়।'

'এ মা, তুমি এখনও গলা থেকে মেডেলটা খোলোনি! হেহে-হেহে।' ছেলেটার হাসি কান অবধি গিয়ে ঠেকেছে, 'যা বিটকেল দেখাচ্ছে না...!'

'মহা ডেঁপো তো তুমি।'

'যাহ্ বাবা, খারাপ কী বললাম? দাও দাও, মেডেলটা খুলে

দাও। পকেটে রেখে দিই।'

'তোমার সাহস দেখে আমি হাঁ হয়ে যাচ্ছি। স্কুল থেকে বেরিয়ে খুব সর্দার বনে গেছ তো! কোন ব্যাচ?'

ছেলেটার হাসি ঝপ করে নিবে গেছে। চোখ গোল গোল করে বলল, 'আআ আমি তো...তুতুতুমি আমায়...!'

'তোতলাচ্ছ কেন, অ্যাঁ? জবাব দাও।'

'কী জবাব দেব? আমি তো বাবুয়া।'

'ডাক নাম নয়। স্কুলের নাম বলো।'

'কী যা তা বকছ? ছেলেটা এবার কাছে এগিয়ে এসেছে, 'আমি বাবুয়া। বাবুয়া। বাবুয়া। তোমায় বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য মা আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে।'

পলকের জন্য থমকালেন স্মৃতিধর। পরক্ষণে দু-গাল ছড়িয়ে হাসি। 'দ্যাখো কাণ্ড, লোকে কেমন অকারণে তাঁকে ভুলো মন বলে অপবাদ দেয়! অঙ্ক কষে কষে স্মৃতিশক্তি সতেজ রেখেছেন বলেই না ছেলেটাকে প্রথম থেকেই তাঁর চেনা চেনা লাগছিল।

শুধু বাবুয়া যে তাঁরই ছেলে, এটুকুই যা মনে করতে পারেননি স্মৃতিধর! এটা কে কি খুব বড় ভুল বলা যায়?

মহাবিদ্যা

সকাল সকাল ব্যাংকে গিয়ে টাকাটা তুলেছিলেন সদাব্রত। মোট পঁয়ত্রিশ হাজার। আজই টাকাটা মিটিয়ে দিতে হবে অবিনাশ হালদারকে, সেই ভাবনা মাথায় রেখেই টাকাটা সাবধানে রেখেছিলেন মানিব্যাগে। সোনারপুর থেকে ঢাকুরিয়া কতটুকুই বা পথ, মাত্র তো পাঁচটা স্টেশন, তবু ভিড় ট্রেনে সদাব্রত সতর্ক ছিলেন যথেষ্ট। হাত রেখেছেন পকেটে, চেপে আছেন মানিব্যাগ...

তাও শেষরক্ষা হল না। ঢাকুরিয়া নামার মুখে হঠাৎই গেটে জোর ধাক্কাধাক্কি। কোনও ক্রমে ঠেলেঠুলে প্ল্যাটফর্মে ঝাঁপ দিয়েই সদাব্রত টের পেলেন সর্বনাশটি ঘটে গেছে। নিপুণ হাতে পকেট থেকে মানিব্যাগটি তুলে নিয়েছে কোনও এক শয়তান।

সদাব্রতর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কী হবে এখন? বড় জোরগলায় অবিনাশকে বলেছিলেন, আজ সূর্য ডোবার আগে তার পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দেবেন, এবার কোন মুখে দাঁড়াবেন অবিনাশ হালদারের সামনে? এই মুহূর্তে তো ব্যাংকে দু-পাঁচ হাজারের বেশি পড়ে নেই, দেনাটা শোধই

বা করবেন কী করে?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো খানিকক্ষণ ঢাকুরিয়া স্টেশনে পায়চারি করলেন সদাব্রত। মগজ খুঁড়ছেন। কে তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে? অফিসের কোনও সহকর্মী? আত্মীয়স্বজন? উঁহু, এত টাকা এক্ষুনি এক্ষুনি কেউ দেবে বলে মনে হয় না। কিন্তু টাকাটি আজ না পেলে অবিনাশ যে কী করবে তা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছেন সদাব্রত। সন্ধে হতে না হতে হাজির হবে বাড়িতে। যাচ্ছেতাই কটুকাটব্য করবে, পাড়ার পাঁচজনকে শুনিয়ে গাল পাড়াও অসম্ভব নয়...ছিছি, বেইজ্জতের একশেষ।

ওফ্, সদাব্রতর যে এখন কী উপায়? কী যে মতিভ্রম হল, কেন যে টাকাটা রাখার জন্য আজ একটা ব্রিফকেস-টিফকেস কিছু সঙ্গে রাখলেন না!

আচমকা মাথায় বিদ্যুতের ঝিলিক। আরে, শান্তিময় আছে না? তাকে একবার স্মরণ করলে কেমন হয়? শান্তি তো তাকে বলেইছিল...

শান্তিময় সদাব্রতর স্কুলের বন্ধু। স্কুল ছাড়ার পর পাক্কা পঁচিশ বছর যোগাযোগ ছিল না শান্তির সঙ্গে। হঠাৎই একদিন দেখা। মাসকয়েক আগে। বালিগঞ্জ স্টেশনে। শান্তি তাঁকে প্রথমটা চিনতে পারেনি, কিন্তু সদাব্রত সহপাঠীকে দেখেই চিনেছেন। এখনও সেই একইরকম রোগা-সোগা চেহারা, মুখে

সেই আগের মতোই লাজুক লাজুক ভাব। পড়াশোনায় খুব একটা ভালো ছিল না শান্তি, টায়েটুয়ে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছিল। কলেজে ভরতি হয়েছিল কিনা তাও আর জানা হয়নি। সদাব্রতর চেনাপরিচিতর জগৎ থেকে শান্তি হারিয়েই গিয়েছিল।

বহুকাল পর সেই শান্তিকে দেখে সদাব্রত তো দারুণ উচ্ছসিত। কাঁধে একটা চাপড় মেরে জিগ্যেস করেছিলেন, 'কী রে, আছিস কেমন?'

শান্তির, সেই স্কুলের শান্তির মতোই, বিনম্র জবাব, 'কোনওরকমে চলে যাচ্ছে রে। তুই কী করছিস?'

'সরকারি অফিসে আছি।...তুই?'

'ছোটখাটো ব্যবসা করছি।'

'মাই গড, তুই বিজনেসম্যান? কীসের ব্যবসা রে?'

'এই রেলেই আমার কারবার।'

'বাহ্, বাহ্, ভালো চলছে তো কাজকর্ম?'

'মন্দ নয়। ট্রেনে যারা যাতায়াত করে, তারাই আমায় মোটামুটি বাঁচিয়ে রেখেছে।'

'ও, তার মানে কাস্টমার সার্ভিসে আছিস?'

'বলতে পারিস।' শান্তি ঘড়ি দেখছিল। মুখটা খানিক কাচুমাচু করেই বলল, 'আজ চলি রে। স্টাফদের নিয়ে একটা জরুরি মিটিং আছে।'

সদাব্রত রীতিমতো মুগ্ধ। সেই মুখচোরা শান্তি এখন এত

বড় ব্যবসাদার যে স্টাফদের নিয়ে মিটিংয়ে বসে! হাসিমুখেই বলেছিল, 'যাহ্, আজ তো তাহলে তোর সঙ্গে আড্ডা মারা হল না! আবার কবে আমাদের দেখা হবে?'

শান্তি হাত কচলে বলেছিল, 'আজকাল ভীষণ ব্যস্ত থাকি রে...'

'তা বলে কোনও দিনও টাইম বার করতে পারবি না?'

'খুব কঠিন রে...। তবে যদি এদিকে কোনও বিপদে পড়িস, ডাকলেই আমি চলে আসব।'

'বিপদ মানে?'

'যে কোনও ধরনের ঝঞ্ঝাট। তবে শুধু এই লাইনে ট্রেনে যাতায়াতের সময়টায়। আমার মোবাইল নাম্বার দিয়ে রাখছি। একটা খালি কল দিবি, ব্যাস।'

'ওমনি তুই মুশকিল আসান করে দিবি?'

'চেষ্টা করব। অবশ্য বিপদটা যদি তোর হয়, তাহলেই ডাকিস, নইলে নয়।'

'কেন? '

'আমি তো সমাজসেবা করি না। তবে তুই পুরোনো বন্ধু, তোর উপকারটুকু করব।'

কথাটায় তেমন আমল দেননি সদাব্রত। তবু নাম্বারটা তোলা আছে নিজের মোবাইল ফোনে। একবার বাজিয়ে দেখবেন নাকি?'

খানিক দোনামোনার পর নম্বর টিপতে ওপারে শান্তির মোলায়েম গলা, 'কী রে, সদা, হঠাৎ কী মনে করে?'

'সর্বনাশ হয়েছে রে। আমার সর্বস্ব খোয়া গেছে।'

'তাই নাকি?' শান্তির স্বরে তাপ-উত্তাপ নেই, 'কোথায়? কী ভাবে?'

'ঢাকুরিয়া স্টেশনে নামার সময়ে। আমার মানিব্যাগটা লোপাট হয়ে গেল।'

'অ। পিকপকেট? কী ছিল মানিব্যাগে?'

'পঁয়ত্রিশটা হাজার টাকার নোট। আর খুচরো বিশ-পঞ্চাশ। সঙ্গে দরকারি কিছু কাগজপত্র।' সদাব্রতর গলায় মিনতি ঝরে পড়ল, 'তুই বলেছিলি, এই লাইনের কোনও ট্রেনে কখনও বিপদে পড়লে তুই সাহায্য করবি...'

'হুম! ঠিক ক'টার সময়ে ঘটেছে ঘটনাটা?'

'এই তো, একটু আগে।'

'উঁহু। কারেক্ট টাইমটা বল। ঠিক কখন ট্রেনে চেপেছিস, কোথ্থেকে উঠেছিলি, ক'টায় নামলি...'

পলকের জন্য সদাব্রত থতমত। তারপর সামান্য চিন্তা করে বললেন, ব্যাংক থেকে বেরোলাম দশটা উনিশে...। স্টেশনে পৌঁছোতে চার মিনিট সময় লেগেছে। তারও পাঁচ মিনিট পর ট্রেন এল। অর্থাৎ সোনারপুরে ট্রেনে পা রেখেছি আমি দশটা আঠাশে। অতএব ঢাকুরিয়ায় নামলাম দশটা

তেতাল্লিশ কি চুয়াল্লিশে।'

'ট্রেনটা কোথ্‌থেকে আসছিল?'

'ডায়মন্ডহারবার।'

'তুই কোন কামরায় ছিলি?'

'পিছন দিক থেকে চতুর্থ।' সদাব্রত ঈষৎ অধৈর্য এবার, 'এত জেনে তুই কী করবি?'

'বা রে, হেল্প করতে গেলে খুঁটিনাটি জানতে হবে না?...যাক গে, এখন তুই কোথায়?'

'ঢাকুরিয়া স্টেশনেই।' সদাব্রত আপন মনে বললেন, পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা না পেলে আমার যে আজ কী দশা হবে...!'

'অত ভাবছিস কেন? আমি তো আছি।'

'কী করবি তুই? টাকাটা আমায় জোগাড় করে দিবি?'

'দেখা যাক!...ততক্ষণ প্ল্যাটফর্মের সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে বসে জিরো। ব্যবস্থা করে আমি ডাক পাঠাব, চলে আসিস।'

'কোথায় যাব? কীভাবে যাব?'

'সে তো তোর ভাবনা নয়। যা করার আমিই করব।'

ফোন কেটে গেল। সদাব্রত ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে বসে আছেন, বসেই আছেন। একের পর এক ট্রেন থামছে স্টেশনে, হুইশিল মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে, যাত্রীরা উঠছে, নামছে...কিছুই যেন সেভাবে নজরে পড়ছিল না সদাব্রতর। টাকার চিন্তাটা

এমন বিশ্রীভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়! বসে থাকতে থাকতে একসময়ে শ্রান্তিতে জড়িয়ে এল চোখ। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, খেয়ালই নেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আজব একটা স্বপ্নও দেখছিলেন সদাব্রত। অবিনাশ হালদার তাঁর বাড়ির সামনে চোঙা ফুঁকছে, টাকা ধার নিয়ে শোধ দেয় না কে? ওমনি পাড়ার সমস্ত বাচ্চারা সমস্বরে চেঁচাচ্ছে, সদাব্রত দে, সদাব্রত দে! বাচ্চাগুলোকে তাড়া করে ভাগাতে যাচ্ছিলেন সদাব্রত, তখনই ভেঙে গেল স্বপ্নটা। কে যেন ঠেলছে সদাব্রতকে...

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সদাব্রত দেখলেন, সামনে এক চোয়াড়ে চেহারার যুবক। পরনে নীল জিন্‌স, হলুদ গেঞ্জি। ভারী সম্ভ্রমের সুরে ছেলেটি বলল, 'স্যার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

সদাব্রত ঢোক গিলে বললেন, 'স্যার মানে কি শান্তিময় সরখেল?'

'হ্যাঁ। জলদি আসুন।'

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে সদাব্রত দেখলেন, লেভেল ক্রসিংয়ের ওপারে ফুটপাথের ধারে, একটা ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে। ছেলেটির ইশারায় উঠে বসলেন গাড়িতে। মুগ্ধ গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এটা কি শান্তিময়ের গাড়ি?'

ছেলেটি জবাব দিল না। ড্রাইভারের আসনে বসেছে। নীরবে স্টার্ট দিল গাড়িতে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গলিঘুঁজি

পেরিয়ে একটা বড়সড় অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়েছে। দরজা খুলে ধরে বলল, 'লিফটে উঠে যান। এই বিল্ডিংয়ের চারতলায় স্যার থাকেন।'

সদাব্রত উত্তরোত্তর মোহিত হচ্ছিলেন। শান্তিময় তো নেহাত হেঁজিপেঁজি ব্যবসায়ী নয়! যথেষ্ট উন্নতি করেছে! পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা সে কি এখনই ধার দেবে বন্ধুকে? শুধু টাকাই নয়, বন্ধুকে সাহায্য করার মতো একটা হৃদয়ও আছে শান্তির, এও কম কথা নয়।

এই সব ভাবতে ভাবতেই ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছে গেছেন সদাব্রত। কাঁপা কাঁপা হাতে কলিংবেল বাজিয়েছেন।

শান্তিই দরজা খুলল। স্মিত মুখে আহ্বান জানাল সদাব্রতকে। অন্দরে ঢুকে সদাব্রতর আক্কেল গুড়ুম। কী বিশাল ফ্ল্যাট! কত সব দামি দামি আসবাব! ঠান্ডা মেশিন চলছে, এই গরমকালেও হিম হয়ে আছে ঘর!

বন্ধুকে সোফায় বসিয়ে শান্তি বলল, 'টেনশান করিস না। তোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

অবিশ্বাসের সুরে সদাব্রত বললেন, 'তুই আমায় দিবি টাকাটা?'

শান্তি মুচকি হাসল। গলা উঠিয়ে ডাকল, 'সুজিত, সামান লে আও।'

হাঁক শুনে এক তাগড়াই জোয়ান ইয়া বড় এক ট্রে হাতে

হাজির। ট্রে-তে সার সার মানিব্যাগ সাজানো। প্রতিটিরই পেট মোটা।

শান্তি শান্ত গলায় বলল, 'দ্যাখ, এর মধ্যে কোনটা তোর।'

চোখ প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল সদাব্রতর। নিজের মানিব্যাগখানা খপ করে তুলে নিয়ে বললেন, 'এই তো! এইটা! এইটা!'

'শিওর?'

'নিজের জিনিস চিনব না?' সদাব্রত ফাঁক করেছেন ম্যানিব্যাগখানা। উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, 'এই তো সেই হাজার টাকার নোটের গোছা! সঙ্গে ট্রেনের মান্থলিটাও আছে! কাগজ-টাগজ, বিল-টিল, সব!'

'তোকে তাহলে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারলাম?'

'অবশ্যই।' বলেই থমকেছেন সদাব্রত। চোখ পিটপিট করে বললেন, 'কিন্তু তুই এগুলো...মানে পকেটমার হয়ে যাওয়া মাল...?'

'আমার কাছেই তো জমা হয় সব।'

'কেন?'

'কারণ ব্যবসাটা আমিই চালাই। সোনারপুর থেকে শেয়ালদা, ট্রেনে যত পকেটমার, প্রত্যেকেই আমার কর্মচারী। সকলেরই ডিউটি বরাদ্দ করা আছে, তারা সেই মতো ট্রেনের কামরায় উঠে উঠে কাজ সারে। তারপর বমাল আমাকে রিপোর্ট করে।

বিনিময়ে মাস গেলে ভালো মাইনে দিই।' শান্তির ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, 'আশা করি তুই পুলিশকে জানাবি না?'

'প্রশ্নই আসছে না। তুই আমার এতখানি উপকার করলি।' সদাব্রত সোজা হয়ে বসলেন, 'কিন্তু তুই এই লাইনে এলি কেন?'

'বলতে পারিস তোদেরই জন্য। তোরাই তো ব্যঙ্গ করতিস, আমার নাকি চোর পকেটমার হওয়ারও যোগ্যতা নেই। তাই স্কুল পাশ করার পর জেদ চেপে গেল। এক ওস্তাদের কাছে ট্রেনিং নিয়ে নেমে পড়লাম লাইনে। দলটা গড়েছি বছরপাঁচেক। বিজনেসটা এখন মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে।' শান্তি গলা ঝাড়ল, 'যাক গে, এবার একটা কাজের কথায় আসি।'

'কী কাজ?'

'যারা তোর মানিব্যাগ হাপিস করেছিল, তাদের দেখলে কি চিনতে পারবি?'

সদাব্রত মাথা চুলকোলেন, 'হয়তো পারব।'

'উম্।' শান্তি ফের গলা ওঠাল, 'সুজিত, উনলোগকো ভেজ দো।'

সুজিত ভেতরে গিয়েছিল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। পিছনে লাইন দিয়ে খানআষ্টেক ছেলে। সকলেই অধোবদন।

আঙুল তুলে শান্তি বলল, 'দ্যাখ তো, এদের মধ্যে কেউ ছিল কি না?'

সদাব্রত ভুরু কুঁচকে দেখলেন মুখগুলোকে। খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে মনে পড়ল, লাইনের পাঁচ নম্বর আর সাত নম্বর ট্রেনের দরজায় গোল পাকাচ্ছিল না? হ্যাঁ তো, ওই পাঁচ নম্বরই তো তাঁকে শেষ মুহূর্তে ঠেলে দিল।

দুই মূর্তিকে চিনিয়ে দিয়েছেন সদাব্রত। বাকি ছেলেগুলো শান্তির নির্দেশে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পরক্ষণে কী কাণ্ড! সদাব্রতকে হতবাক করে দিয়ে শান্তি উঠে দাঁড়িয়েছে, টেবিলে পড়ে থাকা কাঠের রুলখানা তুলে নিয়ে দমাদ্দম পেটাতে শুরু করল ছেলেদুটোকে। নির্বিকার ভঙ্গিতে। ছেলে দুটো যন্ত্রণায় আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে, শান্তির কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই। সদাব্রত আটকাবেন কী, নিজেই ঠকঠক কাঁপছেন। এই শান্তি তাঁর একেবারেই অচেনা।

ছেলে দুটোকে প্রায় আধমরা করে চেয়ারে আসীন হল শান্তি। চেয়ারের পিঠে শরীর ছেড়ে দিয়েছে।

সদাব্রত নার্ভাস গলায় বললেন, 'এত মারধোর করলি কেন? আমার জিনিস তো ফেরত পেয়েই গেছি...'

'ধুস্, ওই ধোলাইটা তো ওদের দরকার। ক্লায়েন্ট ওদের মুখ চিনে ফেলাটা তো অমার্জনীয় অপরাধ।' শান্তি মৃদু হাসল, 'বোঝাই যাচ্ছে, ওদের ট্রেনিং এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

'তার জন্য এত প্রহার?'

'ওটাও তো পার্ট অফ দা ট্রেনিং সদা। ধরা পড়লে যে

গণপিটুনি জুটবে কপালে, সেটাকেও হজম করতে শিখুক। কাল থেকে আবার ওদের ক্লাস শুরু।'

'ক্লাস?'

'বাহ্, স্কুল আছে না এদের! পাশ না করলে চাকরি দেব কেন? আর এরা তো প্র্যাকটিকালে ফেল করে গেছে! অঙ্গুলিচালন, পকেট কর্তনে দক্ষ হলেই চলবে না, আত্মগোপন বিদ্যাটাও রপ্ত হওয়া তো প্রয়োজন। চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ো ধরা। ঠিক কি না বল?'

কী বলবেন সদাব্রত? ঘাড় আর নাড়বেন কী করে, ঘাড় তো তাঁর আটকে গেছে।

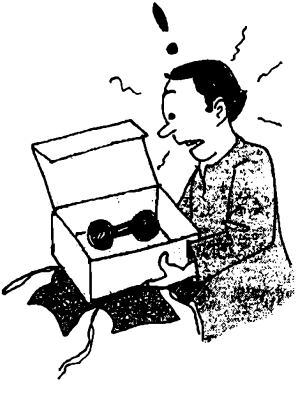

আজব ভুল

শনিবারের দুপুর। কাঁটায় কাঁটায় একটা দশে স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজল ঢংঢং। ওমনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন স্মৃতিধর। ভূগোলের হিমালয়বাবু আজ অনুপস্থিত বলে তাঁকে ক্লাস সিক্সের শেষ পিরিয়ডটা নিতে পাঠিয়েছিলেন হেড মাস্টারমশাই। কিন্তু স্মৃতিধরের মতো গণিতবিশারদের পক্ষে ভূগোল পড়ানো যে কী বেদনাদায়ক! দুনিয়ায় কোথায় কোন আগ্নেয়গিরি আছে, কোথায় বা সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত— জেনে কী মোক্ষ লাভ হয় ছাত্রদের! আজারবাইজানের মাটির নীচে খনিজ তেল পাওয়া যায় কি না, কিংবা মুণ্ডুমালাই জঙ্গল কোন রাজ্যে, এসব তথ্যই বা মগজে পুরে হবেটা কী!

স্মৃতিধর অবশ্য ফালতু কচকচিতে যাননি। বুদ্ধি করে বায়ুমণ্ডলের একটা অংকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেদের। খুবই সোজা পাটিগণিত। পৃথিবী থেকে প্রতি এক কিলোমিটার ওপরে যদি বায়ুর চাপ দু-সেন্টিমিটার করে কমে, আর জলীয় বাষ্পের চাপ এক মিলিমিটার করে বাড়ে, তা হলে সূর্যপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে বায়ু ও জলীয় বাষ্পের চাপ কোথায় দাঁড়াবে? ছেলেগুলো মহা

বুদ্ধু, সারাক্ষণ শুধু মাথা চুলকে গেল, অংকটা কেউ শুরুই করতে পারল না। এমত অবস্থায় কাঁহাতক ক্লাসে বসে থাকা যায়?

তা যাক গে, স্মৃতিধর এখনকার মতো তো নিশ্চিন্ত। অংকটা যদিও মাথায় ঘুরছে। নিজেকেই কষতে হবে, নিজেকেই কষতে হবে। কাল রবিবার, সারাদিন অফুরন্ত সময়, কালই নয় বসবেন সমাধানে।

স্টাফরুমে এসে স্মৃতিধর ঢকঢক জল খেলেন খানিকটা। এবার গৃহে ফেরার পালা। ব্যাগ-ছাতা হাতে তুলেও থমকালেন সহসা। ছুটির পর কী একটা কাজ ছিল না আজ? মনে হওয়া মাত্র হাত ঢুকিয়েছেন পকেটে। হ্যাঁ, যা ভেবেছেন তাই। গিন্নির চিরকুট মজুত।

টুকরো কাগজটা বার করে পড়লেন স্মৃতিধর। দুপুরে তোমার ছাত্র চঞ্চলদের বাড়ি যেও কিন্তু। সঙ্গে ফুল নিতে ভুলো না।

ভুরু কুঁচকে স্মৃতিধর ভাবলেন কয়েক সেকেন্ড। চঞ্চল কোন জন যেন? মনে পড়েছে। খুবই প্রিয় ছাত্র ছিল তাঁর। বছরদশেক আগে স্কুল পাশ করেছে। মাথা ভারী সাফ ছিল চঞ্চলের। স্মৃতিধর নিজে ছেলেটার নতুন পাড়ার বাড়িতে গিয়ে অংক দেখিয়ে আসতেন। চঞ্চল এখন এম.এস.সি. করে চাকরিতে ঢুকেছে। বাড়িতে একদিন মিষ্টিও দিয়ে গিয়েছিল।

এতগুলো কথা একসঙ্গে স্মরণ করতে পেরে ভারী তৃপ্তি বোধ করলেন স্মৃতিধর। হাহ্, লোকে যে কেন তাঁকে ভুলো-মন বলে!

তা চঞ্চলের বাড়ি যেতে হবে কেন? উপলক্ষ্যটা কী? অন্নপ্রাশন? চঞ্চল তো এখন ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের জোয়ান, এই বয়সে অন্নপ্রাশন কি স্বাভাবিক? অন্য কারও হতে পারে অবশ্য। কার। চঞ্চলের ছেলের? কিন্তু চঞ্চলের তো এখনও বিয়ে হয়নি!

তাহলে বোধহয় আজ চঞ্চলের বিয়ে। উঁহু, ছেলের বাড়িতে তো বিয়ে হয় না। যত দূর মনে পড়ে, স্মৃতিধরও তো টোপর পরে গিন্নির বাড়িই গিয়েছিলেন। তবে বউভাতটা স্মৃতিধরদের বাড়িতেই...

স্মৃতিধরের দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গিন্নি যখন ফুল নিয়ে যেতে বলেছেন, অনুষ্ঠানটা বউভাতই। এই সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের দ্বিতীয় কোনও উত্তর সম্ভবই নয়।

নিখুঁত গাণিতিক নির্ণয়টা সেরে স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে এলেন স্মৃতিধর। সামনে গিন্নির ঠিক করে দেওয়া রিক্সাচালক। স্মৃতিধরকে নিয়ে ইদানীং যাতায়াত করে ছোকরা। রিক্সায় চড়ে স্মৃতিধর খোশমেজাজে বললেন, 'চলো হে গদাই, এবার রওনা দিই।'

ছেলেটি অসন্তুষ্ট স্বরে বলল, 'আমি গদাই নই স্যার। আমার

নাম সুভাষ।'

'সে কী? আজ সকালেও তো তোমায়...'

'না স্যার। সকালে আমায় পরেশ নামে ডাকছিলেন। কাল বলছিলেন হারান। পরশু ছিলাম দিলীপ। তার আগের দিন ব্রজ।' ছেলেটাকে কেমন কাঁদো কাঁদো দেখাল, 'এরকম চলতে থাকলে নিজের আসল নাম যে ভুলে যাব স্যার।'

'ঠিক আছে বাবা বিভাস, আর গণ্ডগোল হবে না।'

'বিভাস না স্যার। সুভাষ। সুভাষ।' ছোকরার এবার বেশ বিপর্যস্ত দশা। ছলছল চোখে একটুক্ষণ স্মৃতিধরের দিকে তাকিয়ে থেকে প্যাডেলে চাপ দিল। গুমগুমে গলায় বলল, 'এখন তো প্রথমে ফুলের দোকান?'

'হ্যাঁ।'

'তার পর তো নতুন পাড়া?'

'আশ্চর্য, তাও জানো?'

'আজ্ঞে, মাসিমা আমাকে বলে দিয়েছেন।'

স্মৃতিধর রীতিমতো ক্ষুব্ধ বোধ করলেন এবার। গিন্নি তাঁকে ভাবেনটা কী? স্মৃতিধর কি এতটাই বেভুল, যে এই সুজিত...না না, সুধীর...না না, গোপাল...ধুৎতোর ছাই নাম মনে পড়ে না ছেলেটাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে হবে? নাহ্, সাইকেল ছাড়াটা স্মৃতিধরের গোখ্‌খুরি হয়েছে। যতই ডান-পা, বাঁ-পা গুলিয়ে যাওয়ার সমস্যা থাক, ওই দু-চাকায় তাও তো একটা

স্বাধীনতা ছিল। এখন রিক্সার যাঁতাকলে পড়ে তিনি পুরোপুরি পরনির্ভর।

ক্ষোভটা অবশ্য বেশিক্ষণ রইল না। সামাজিক অনুষ্ঠানে কি ভারমুখে যাওয়া উচিত, এই ভেবে নিজেকে প্রসন্ন করলেন স্মৃতিধর। দৃষ্টি মেলেছেন খোলা আকাশে। পৌষ মাস, বেলা পড়ে আসছে।

'হ্যাঁ স্যার। চঞ্চল সরকারের বাড়ি। যেখানে প্যান্ডেল হয়েছে।'

'গুড। চলো।'

এগোচ্ছে রিক্সা। হঠাৎ স্মৃতিধরের ভুরুতে ভাঁজ। চঞ্চল দুপুরবেলা নেমন্তন্ন করেছে কেন? ভরদুপুরে বিয়ে করছে? বাঙালিদের কি দুপুরে বিয়ে হয়! ক্ষণপরেই চিন্তাটাকে টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেললেন স্মৃতিধর। দুপুর, সন্ধে, সবই তো আপেক্ষিক। এখানে যদি এখন দুপুর দুটো, তাহলে অস্ট্রেলিয়ায় ছ'টা-সাড়ে ছ'টা। নিউজিল্যান্ডে আটটা। আরও পুবে, ফিজিতে গেলে রাত দশটা হওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং ফিজির হিসেবে তো বেশ রাতেই বিয়ে হচ্ছে। নয় কি?

এসে গেছে নতুন পাড়া। চঞ্চলদের বাড়ি। রিকশা থেকে নেমে স্মৃতিধর প্যান্ডেলটায় চোখ বেলালেন। মোটেই প্রকাণ্ড নয়, বরং ছোটখাটোই। এবং ধবধবে সাদা। প্রীত হলেন স্মৃতিধর। দিব্যি সাদামাটা আয়োজন, হইহল্লা রং-চং নেই,

মাইকে সানাই বাজছে না, এরকম পরিবেশই বা মন্দ কী!

স্মৃতিধরকে দেখে চঞ্চল বেরিয়ে এসেছে। হাতজোড় করে বলল, 'আসুন স্যার।'

চঞ্চলের পরনে ধুতি, খালি গা, মাথা মসৃণভাবে কামানো। স্মৃতিধর অবাক মুখে জিগ্যেস করলেন, 'ন্যাড়া হয়েছ যে?'

চঞ্চল শুকনো মুখে হাসল, 'এটাই তো প্রথা স্যার।'

'ও।' স্মৃতিধর ঈষৎ থতমত। বাঙালিদের বিয়েতে মস্তক মুণ্ডনের নিয়ম আছে তাহলে? কত কিছুই যে স্মৃতিধর এখনও জানেন না! অল্প হেসে বললেন, 'অনুষ্ঠান কি শেষ?'

'হ্যাঁ স্যার। একটু আগে ক্রিয়াকর্ম চুকল।... দাঁড়িয়ে কেন স্যার? ভেতরে আসুন।'

অন্দরে প্রবেশ করে স্মৃতিধরের মুগ্ধতা যেন বেড়ে গেল। লোকজন ঘোরাফেরা করছে প্রচুর, তবে অনর্থক কোনও ক্যালোর-ব্যালোর নেই। সুন্দর একটা শান্তি বিরাজ করছে চতুর্দিকে। উঁকি দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের জায়গাটি দেখলেন ঝলক। এখনও কোশাকুশি, ফুল, বেলপাতা, গঙ্গাজলের ঘট ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। প্রদীপ জ্বলছে। এক গোছা ধূপও। সঙ্গে একটি টুলে প্রকাণ্ড বাঁধানো ফটোগ্রাফ, ফুলে, মালায়, প্রায় ঢাকা।

ছবির বয়স্ক মানুষটিকে দেখিয়ে স্মৃতিধর জিগ্যেস করলেন, 'ইনি কে?'

'উনিই তো...আমার বাবা।'

বাহ্, বাহ্, চঞ্চলের ভক্তিশ্রদ্ধার প্রশংসা করতে হয়। এমন শুভ কাজের দিনে বাবাকে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়েছে! হাতের গোলাপগুচ্ছ চঞ্চলকে দিয়ে বললেন, 'এটা রাখো। আজকের দিনে ফুলই তো...'

'হ্যাঁ স্যার। সে তো বটেই।' ফুলের তোড়া ছবির সামনে রেখে চঞ্চল বলল, 'চলুন স্যার, এবার একটু কিছু মুখে দেবেন। অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

নিরামিষ আহারের বন্দোবস্ত। লুচি, বেগুনভাজা, ধোঁকার ডালনা, ছানার চপ, চাটনি, মিষ্টি। সামনে দাঁড়িয়ে ভারী যত্ন সহকারে স্মৃতিধরকে খাওয়াচ্ছে চঞ্চল। আনারসের চাটনি চাটতে চাটতে স্মৃতিধর বলে ফেললেন, 'আমিষ কিছু করোনি, তাই না?'

'আমাদের নিয়ম নেই স্যার। মাছ-টাছ পরশু হবে। আপনাকে কিন্তু সেদিনও একবার আসতে হবে স্যার।'

মনে মনে খুশি হলেন স্মৃতিধর। মুখে বললেন, 'আহা, এক দিনই তো যথেষ্ট। একই অনুষ্ঠানে দু-দুবার পাত পাড়ার কী দরকার!'

'ও কথা বলবেন না স্যার। আপনি পিতা সমান। আর একদিন আপনার পায়ের ধুলো পড়লে ধন্য হব।'

'বেশ, বেশ। এত করে যখন বলছ...'

ভোজন শেষ। উঠলেন স্মৃতিধর। হাত ধুতে ধুতে আচমকা

নজরে পড়ল, চঞ্চলের দুই দাদাও মাথা মুড়িয়েছে। তিন ভাইয়ের কি একসঙ্গে বিয়ে হচ্ছে? নাকি এক ভাইয়ের বিয়েতে বাকি ভাইদের চুল ফেলতে হয়? এই পরিবারের হয়তো এমনটাই রীতি।

স্মৃতিধর আর বসলেন না। পরিতৃপ্ত মেজাজে ফের চাপলেন রিক্সায়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎই মনে হল, কী যেন একটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। কী যেন? কী যেন?

বাড়ি ঢুকেই গিন্নির মুখোমুখি। সরাসরি প্রশ্ন উড়ে এল, 'ফুল নিয়ে গিয়েছিলে?'

স্মৃতিধর দু-গাল ছড়িয়ে হাসলেন, 'আরে, আমার কি ভুল হয়!'

'চঞ্চলকে কেমন দেখলে? এখনও কান্নাকাটি করছে?'

'সে কী! স্মৃতিধর আকাশ থেকে পড়লেন,—বিয়েতে ছেলেরা কাঁদে নাকি? ওটা তো মেয়েদের একচেটিয়া। শ্বশুরবাড়ি আসার দিন তুমি যা কান্না জুড়েছিলে!'

'অ্যাই, দাঁড়াও দাঁড়াও। গিন্নির চোখ পিটপিট, 'কার বিয়ে?'

'কেন? চঞ্চলের! ভারী ভালো ছেলে। কোনও বাহুল্য নেই, মাইক চালিয়ে পাড়া মাত করছে না...সুন্দর নীরবে সারছে বউভাতটা। শুভ দিনে বাবার ছবিতে কত ফুল চড়িয়েছে, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।'

'ওমা, কী সব্বনেশে কথা! বউভাত কেন হতে যাবে,

চঞ্চলের বাবার তো আজ শ্রাদ্ধ! গুরুদশা চলছিল, বাড়ি বয়ে এসে আমায় বলে গেল...'

ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন স্মৃতিধর। শোকার্ত ছেলেটাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে আনন্দানুষ্ঠান ভেবে এক-পেট খেয়ে এলেন! ইস্, ছেলেটা কী যে ভাবল!

পরক্ষণে স্মৃতিধর হেসে ফেলেছেন। মাথা নাড়ছেন আপন মনে। কাজের বাড়ির থেকে বেরিয়ে কী যেন একটা বাকি রয়ে গেল ভাবছিলেন না? এতক্ষণে স্মরণে এসেছে। বউ দেখেননি, বউ দেখেননি!

এহেহে, তখনই তো বোঝা উচিত ছিল ওটা বিয়েবাড়ি নয়, শ্রাদ্ধবাড়ি!

দৌড়বীর

সামনের ছোট মাঠটাকে ঘোঁত ঘোঁত করে চক্কর দিচ্ছিল ভোম্বল। একবার, দু-বার, পাঁচবার, দশবার, কুড়িবার...। আজ তাকে কামাল করতেই হবে। নইলে যে তার দৌড়বীর নামটাই বৃথা।

হ্যাঁ, সম্প্রতি ভোম্বল দৌড়বীর আখ্যা পেয়েছে বন্ধুদের কাছ থেকে। অকারণে নয় অবশ্য। সব কাজই সে দৌড়ে দৌড়ে করে কিনা, তাই। স্কুল যাতায়াতের সময়ে সে কক্ষনো হাঁটে না। দোকান-বাজার যেখানেই তাকে পাঠাও, সে ছুটেই যাবে। এমনকী স্যার যদি কখনও বোর্ডে অংক কষতে ডাকেন, তখনও ভোম্বল পড়িমরি দৌড়োয়। অংক সে কোনও সময়েই করে উঠতে পারে না। হয় যোগে ভুল, নয় গুণে গলতি। কিন্তু দৌড়ে যাওয়ার উৎসাহে তার ভাটা নেই এতটুকু। রাস্তায় কখনও সাইকেলের সঙ্গে পাল্লা টানছে, কখনও বাসের সঙ্গে। এমনকী ঠেলাগাড়িকেও সে কখনও হেঁটে পেরোয় না, তার পা দু-খানা আপনা-আপনি ছুটতে শুরু করে। এমন এক দৌড়পাগলকে বন্ধুরা আর কী নামেই বা ডাকবে!

তা বন্ধুদের দেওয়া নামের মর্যাদা রাখতেই বুঝি এবার ধুন্ধুমার ক্লাবের দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে ভোম্বল। কিন্তু এমনই কপাল, কাল পরপর তিনটে ইভেন্টে সে বাতিল হয়ে গেল। একশো মিটার। দুশো মিটার। চারশো মিটার। প্রত্যেকটাতেই তিন তিনবার ফল্‌স স্টার্ট। বন্দুকের আওয়াজ শোনার আগেই কেন যে তার পা লাইন থেকে বেরিয়ে যায় বারবার? তবে ভোম্বল মুষড়ে পড়ার ছেলে নয়, এখনও আটশো মিটার রেস বাকি, সে আজ দেখিয়ে দেবে দৌড় কাকে বলে।

আর তারই প্রস্তুতি চলছে সকাল থেকে। মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছেন ভোম্বলের বাবা, হাতে খেলনাবন্দুক। তিনি ক্যাপ ফাটালেই সচল হচ্ছে ভোম্বলের পা, চক্রাকারে ঘুরে এসে থামছে খানিক, আবার ক্যাপের শব্দ, আবার যাত্রা শুরু...

গুনে গুনে ছেলেকে একশো বার চরকি খাইয়ে খেলনাবন্দুক পকেটে পুরলেন ভোম্বলের বাবা। গম্ভীর মুখে বললেন, 'আশা করি, আজ আর ভুলচুক হবে না?'

ভোম্বল ঢকঢক ঘাড় নাড়ল, 'না বাবা।'

'মনে আছে কী বলেছি?'

'হ্যাঁ।'

'শোনা তো।'

'ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে কান খাড়া রাখব।'

'হুম্ খেয়াল রেখো, গলায় মেডেল ঝুলিয়ে না ফিরলে আজ থেকে তোমার দৌড় বন্ধ।'

'অবশ্যই।'

আটটা বাজে। বাড়ি ফিরে জলখাবার সারল ভোম্বল। দুটো কলা, দু-পিস টোস্ট, একটা ডিমসেদ্ধ। আজ দুধ নয়, দুধ খেলে দৌড়ের সময়ে গা গুলোতে পারে। পেটটাও একটু খালি রাখা ভালো, তাতে শরীর ঝরঝরে থাকে।

বাবা-মাকে প্রণাম সেরে ভোম্বল বেরিয়ে পড়ল। ধুন্ধুমার ক্লাবের মাঠে পৌঁছে দেখল কাতারে কাতারে লোক, প্রতিযোগীরাও সব হাজির, স্পোর্টস্ প্রায় শুরুর মুখে।

কিট্সব্যাগখানা খুলে রানিং শ্যু বার করল ভোম্বল। পরছে। সামনে হঠাৎ হেলাবটতলার রানা। কাল তিন তিনটে দৌড়ে রানা প্রথম হয়েছিল, মুখে তার বেশ গর্বিত গর্বিত ভাব।

সরল মনে ভোম্বল জিগ্যেস করল, 'কিছু বলবে?'

রানা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'নাহ্। শুধু তোর সাহস দেখে অবাক লাগছে।'

'কেন? কী করলাম?'

'কাল একটা রেসও শুরু করতে পারলি না, ফের আজ দৌড়োতে এসেছিস?'

'আজ ভুল হবে না। যা প্র্যাকটিস করেছি...কান আমার

সারাক্ষণ খাড়া থাকবে।'

'বটে? তুই বুঝি কান দিয়ে দৌড়োস?'

'উঁহু, পা দিয়েই ছুটি।' ভোম্বলের এবার বেশ রাগ হয়ে গেল। গরগরে গলায় বলল, 'আর আমার পা দু-খানা তোর পায়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশি মজবুত। আজ তোকে টের পাইয়ে ছাড়ব।'

'আরে, যা। দৌড়তে গেলে আসল যেটা লাগে, সেটা হল মগজ।' রানা টকটক করে ভোম্বলের মাথায় আঙুল ঠুকল, 'সেই মগজটিই তো তোর ফাঁকা। ঘিলু নেই।'

শুনেই চড়াং মেজাজ চড়ে গেছে ভোম্বলের। প্রায় তেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই রানা ধাঁ। খানিক তফাতে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প জুড়েছে রানা, আঙুল তুলে দেখাচ্ছে ভোম্বলকে, আর খ্যাকখ্যাক হাসছে। অবিকল শেয়ালের মতো।

ভোম্বল চোয়ালে চোয়াল ঘষল। নাহ্, রানাকে একটা শিক্ষা দিতেই হবে।

প্রথমেই আজ আটশো মিটারের হিট। মাইকে নাম ঘোষণা চলছে প্রতিযোগীদের। ভোম্বলের গ্রুপে রানা নেই, গুমগুমে মুখে স্টার্টিং ব্লকে এসে দাঁড়াল ভোম্বল। কান দুটোকে অতি সতর্ক রেখে। গুলির আওয়াজ শোনামাত্র ছিটকে বেরোল। হরিণপায়ে দৌড়, পৌঁছেছে সবার আগে।

একটু বুঝি জুড়োল প্রাণটা। এবার সেকেন্ড হিট, এবারেও

রানা নেই। ভোম্বল আবার প্রথম। শেষে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে রানার। ভেতরের জেদটাই যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল ভোম্বলকে। অনায়াসে রানাকে টপকে গেল। ফিতে যখন ছুঁয়েছে, রানা অন্তত পাঁচ মিটার পিছনে।

এবার ভোম্বলের প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'কী রে, আমার কেরামতিটা দেখলি তো?'

রানা নির্বিকার। হাসতে হাসতে বলল, 'আরে দূর, সেমিফাইনালে কেউ তুরুপের তাস দেখায় নাকি! আমিও তো ফাইনালে উঠেছি, মোকাবিলা সেখানেই হবে।'

শুরু হতে চলেছে লড়াইয়ের শেষ ধাপ। ছেচল্লিশ জন প্রতিযোগীর মধ্যে টিকে আছে মাত্র আট। মাইকে আহ্বান শুনে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ভোম্বলের ঠিক পাশেই রানা, তার ঠোঁটে এখনও সেই বাঁকা হাসি।

যথাসময়ে বেজে উঠল বন্দুক। কান সজাগ রেখে জ্যান্ত তিরের মতো ছুটে বেরোল ভোম্বল। এক এক পাক দুশো মিটার। কী আশ্চর্য, রানাও যেন উড়ে চলেছে! প্রথম পাকে রানাই সবার আগে। ভোম্বল চোয়ালে চোয়াল চেপে গতি বাড়াল, যাক্, দ্বিতীয় দফায় ধরে ফেলেছে রানাকে। তৃতীয় দুশো মিটারে রানার বিদ্রূপটাকে স্মরণ করেই বুঝি আরও দ্রুত ছুটছে ভোম্বলের পা। অতিক্রম করে গেল রানাকে। অন্তিম রাউন্ডে দূরত্ব বাড়ছে ক্রমশ, বেড়েই চলেছে। ভোম্বলকে আর

পায় কে!

ঠিক তখনই পিছন থেকে রানার গলা, 'তুই তো বাতিল রে ভোম্বল! তোর জার্সিতে তো নম্বর নেই!'

বাক্য দুটো যেন খ্যাঁচ করে বিঁধল ভোম্বলের কানে। সঙ্গে সঙ্গে পা নিশ্চল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করছে জার্সির পিঠটা। তুৎ, কী ভুলভাল বকছে রানা! এই তো নম্বর! বড় বড় করে লেখা, সেভেনটিন!

পলক ভাবনাটুকুর মাঝেই দর্শকদের বিপুল হর্ষধ্বনি। ঝমাঝম করতালি বাজছে। ভোম্বল চমকে দেখল, রানা পৌঁছে গেছে প্রান্তসীমায়। মাথা ঝুঁকিয়ে গ্রহণ করছে দর্শকদের অভিনন্দন।

যাহ্, ভোম্বল হেরে গেল!

রাত গভীর। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল ভোম্বল। কিছুতেই ঘুম আসছে না। তার নয় বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম, তা বলেই এইভাবে তাকে বোকা বানাল রানা? সেই বা কেন এত গোবর গণেশ, তিন তিনবার রেসে দৌড়েও কেন সে আক্কেল খুইয়ে জার্সিতে নম্বর আছে কি না দেখবে? নাহ্, সত্যিই তার ঘিলু বলে কিছু নেই। বাবা তো সাফ সাফ বলে দিলেন, কাল থেকে ভোম্বলকে দৌড়োতে দেখলেই ঠ্যাং খোঁড়া

করে দেবেন। খুবই ন্যায্য কথা। এবার বন্ধুরা দৌড়বীর খেতাবটা কেড়ে নিলেই ভোম্বলের অপমানের ষোলো কলা পূর্ণ হয়। উঁহু, আর দৌড়োদৌড়ি নয়, এবার থেকে ধীরেসুস্থেই হাঁটবে ভোম্বল। পা দুটোকে না চালিয়ে বরং মুগজটাকে চালাবে।

হঠাৎ টুক করে একটা শব্দ।

ভোম্বলের স্নায়ু টানটান। অন্ধকারে দৃষ্টি বুলিয়ে মনে হল, কেউ যেন ঢুকেছে ঘরে।

এত রাতে কে রে বাবা? চোরটোর নয় তো?

হ্যাঁ, চোরই। কী নিপুণ কৌশলে জানলার শিক বেঁকিয়ে ফেলেছে! ছায়ার মতো নিঃশব্দে ঘুরছে ঘরময়!

কী করা উচিত ভোম্বলের? লাফিয়ে ধরবে চোরটাকে? কিন্তু এখনও তো কিছু চুরি করেনি! চোর বলে প্রতিপন্ন করবে কীভাবে?

পা না খেলিয়ে মাথা খেলাচ্ছে ভোম্বল। চুপচাপ ধৈর্য ধরে দেখছে চোরের কার্যকলাপ।

মাত্র কয়েক মিনিটেই স্বমহিমায় বিকশিত হয়েছেন চোর বাবাজীবন। খুটখাট কী যেন করল, খুলে গেছে আলমারি। পুট করে লকারটাও। টপাটপ গয়নাগুলো বের করছে না? মার গলার হার, বালা, চুড়...আরও কী কী যেন থাকে ওই কুঠুরিতে? সব নিয়ে নিল? কাঁধে একটা ঝোলাব্যাগ এনেছে

চোরটা, ভরছে একের-পর-এক। বাবার মানিব্যাগখানা টিপেটুপে দেখল। চালান করছে ঝোলায়।

এখন ভোম্বল উঠবে কী? বমাল ধরবে লোকটাকে? ভোম্বলের মগজ কী বলে? উঁহু, আর একটু অপেক্ষা করা দরকার। লোকটা তো ভোম্বলের হাতের নাগালে, দেখাই যাক না কত দূর বাড়তে পারে।

চোরের সাহস সত্যিই তুলনাহীন। টেবিলটাকে ঝেঁটিয়ে সাফ করছে এবার। টাইমপিস্, এ বছর জন্মদিনে পাওয়া ভোম্বলের ঘড়িখানা, বাবার পার্কার পেন, কিছুই তো বাদ দেয় না! কী কাণ্ড, ভোম্বলের জ্যামিতিবক্সটাও মেরে দিল?

আর সহ্য হল না। ভোম্বল নিঃসাড়ে বিছানা ছেড়ে নামল। বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে লোকটার ওপর। কী ধড়িবাজ লোক, ভোম্বল দুহাতে জাপটে ধরা মাত্র পাঁকাল মাছের মতো পিছলে গেল! চোখের পলক পড়ার আগেই দরজা খুলে উধাও।

এ হেন পরিস্থিতির জন্য মোটেই তৈরি ছিল না ভোম্বল। তবে এখন তার মস্তিষ্ক ভীষণ ভাবে সক্রিয়, পরমুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তাড়া করেছে লোকটাকে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখল, বেশি দূর যেতে পারেনি, চোর ফুটপাথ ধরে ছুটছে।

ইচ্ছে করলেই ভোম্বল একটা শোরগোল তুলতে পারত। তার হাঁক-ডাকে নির্ঘাত জেগে যেত পাড়া-পড়শি, লোকটাকে

পাকড়াও করতে কোনও মুশকিলও হত না। কিন্তু পা চালু হতেই মগজ যে নিশ্চল।

চোর ছুটছে, ভোম্বলও ছুটছে। চোর ছুটছে, ভোম্বলও ছুটছে।

কী অসম্ভব জোরে দৌড়োয় রে ভাই, কিছুতেই ভোম্বল লোকটাকে ধরতে পারছে না! চোয়ালে চোয়াল কষে গতি বাড়াল ভোম্বল। আস্তে আস্তে ব্যবধান কমছে যেন! এ কী, আবার বেড়ে গেল না? শরীরের সমস্ত শক্তি পায়ে সংহত করে আরও গতি বাড়াচ্ছে ভোম্বল, আরও বাড়াচ্ছে...। মুঠো করা দুটো হাত দুলছে পিস্টনের মতো।

আশ্চর্য, শেষ কিনা চোরের কাছেও হেরে যাবে ভোম্বল?

পলকের জন্য রানার মুখটা মনে পড়ল। অমনি যেন লাফিয়ে বেড়েছে গতি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভোম্বল চোরের পাশাপাশি। এবং তার পরমুহূর্তেই চোরকে পিছনে ফেলে অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে ভোম্বল। জিতেছে! জিতেছে!

মাথার ওপর দু-হাত ঝাঁকিয়ে ভোম্বল ঘুরে তাকাল। চোরটা নেই। হেরে গিয়ে লজ্জায় পালিয়েছে ব্যাটা। অনেক কিছুই নিয়ে গেল। নিক্ গে। জয়ের আনন্দর চেয়ে কি তার দাম বেশি!

চোরের উপর বাটপারি

পাক্কা ছ'মাস পর এবার জেল থেকে ছাড়া পেল সনাতন। খালাসের আগে নিয়ম মাফিক ডাক পড়েছে জেলারের ঘরে। গুটিগুটি পায়ে সনাতন হাজির হতেই বজ্রবাহু সাঁপুইয়ের জোর হুঙ্কার, 'কী রে ব্যাটা, বেরিয়েই আবার চুরি শুরু করে দিবি তো?'

সনাতন অতি বিনয়ী মানুষ। মিছে কথা বলাও তার ধাতে নেই। ঘাড় চুলকে বলল, 'প্রত্যেকবার একই প্রশ্ন করেন কেন স্যার? জানেনই তো, চুরি আমাদের তিন পুরুষের পেশা।'

'এটা এমন কিছু বড়মুখ করে বলার কথা নয়। নিজেকে শোধরা। ভালো হয়ে যা।'

'ইচ্ছে তো করে স্যার। কিন্তু বংশের বৃত্তি ছেড়ে দিলে পাপ লাগবে না?'

'ওরে আমার পুণ্যবান যুধিষ্ঠির রে! লজ্জা করে না, সাড়ে পাঁচ বছর এই জেলে আমি রয়েছি, তার মধ্যে চার-চারবার তোর চাঁদমুখ আমায় দেখতে হল!'

দারোগা, জেলারদের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করার অভ্যেস

নেই সনাতনের। কিন্তু আজ যে কী মতিভ্রম হল, দুম করে বলে ফেলেছে, 'লজ্জা তো আপনারই পাওয়ার কথা স্যার। সরকার আপনাকে প্রোমোশনও দেয় না, বদলিও করে না। এ কি আমার দোষ?'

ব্যাস, আর যায় কোথায়। আগুনে যেন ঘি পড়ল। চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠলেন বজ্রবাহু। আঙুল নাচিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে ফিচলেমি হচ্ছে, অ্যাঁ? এই বলে রাখছি, আমি থাকতে আর যদি এ মুখো হয়েছিস তো আমার একদিন কী তোর একদিন। তোর হাড় ক'খানা আমি গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছাড়ব।'

জেলারসাহেবের অগ্নিমূর্তি দেখে সনাতন আর কথা বাড়াতে ভরসা পেল না। ঢক করে ঘাড় নেড়ে চটপট কয়েদির পোশাক ছেড়ে পরে নিল প্যান্ট-শার্ট। জেলে থাকার সময় খেটেখুটে যে ক'টা পয়সা রোজগার করেছিল, গুনে-গেঁথে নিয়ে মানে মানে ফটক পেরিয়েছে।

রাস্তায় নেমেও বজ্রবাহুর শাসানিটা সনাতনের কানে বাজছিল। ছ্যা, ছ্যা, জীবনে ঘেন্না ধরে গেল। জেলখানায় আসা-যাওয়ার স্বাধীনতাটুকুও আর থাকবে না। এই যে জেল থেকে বেরোনোর সময়ে গেটের পাহারাদার রামুদা কী দুঃখু দুঃখু চোখে তাকিয়ে থাকে, যেন বলতে চায় 'আবার হবে তো দেখা, এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো...' এই আকুতি কি মিথ্যে হয়ে যাবে?

সত্যি বলতে কী, উঁচু পাঁচিলের অন্দরেই দিনগুলো বেশি সুখে কাটে সনাতনের। বাইরে থাকা মানেই তো হ্যাঙ্গামা। আজ রাতে এদিকে ছোট তো কাল রাতে ওদিকে। ভিতরে আহার নিদ্রা নিয়ে কোনও দুর্ভাবনা নেই। টাইমে টাইমে খানা, রাত্তিরে তোফা ঘুম...। নিয়মিত যাতায়াতের সূত্রে ইয়ারদোস্তও কম নেই। তাদের সঙ্গে মৌজমস্তিও চলে জব্বর। তবে এর পরে এলে আর অত আরাম থাকবে কি? যা চটলেন জেলারবাবু, নির্ঘাত ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে প্রাণের ঝাল মেটাবেন। ধোলাইকে অবশ্য সনাতন পরোয়া করে না, খাওয়ার অভ্যেস তো আছেই। ধরতে পারলে চোরকে কি কেউ সহজে ছাড়ে? একচোট গোবেড়েন দিয়ে তবেই না ডাকে পুলিশকে। কিন্তু জেলে ঢুকেও যদি মার খেতে হয়, মানসম্মানের আর রইল কী!

তা হলে সনাতনের এখন কী করা উচিত? বজ্রবাবুর দাবড়ানি খেয়ে ছেড়েই দেবে লাইন? চুরিবিদ্যে ছাড়া আর সে জানেটা কী? গেরস্তবাড়ি বা কোনও দোকান-টোকানে যে কাজ ধরবে, সে গুড়ে মন মন বালি। এ তল্লাটে সনাতন অতি চেনামুখ। সাধ করে কে তাকে পুষবে? একমাত্র মোটফোট বওয়া যেতে পারে। তবে আগে এক-দুবার চেষ্টা করে দেখেছে সনাতন, পোষায়নি। বড্ড ধকল, তুলনায় রোজগার কম। তা ছাড়া কাঁধের মাল লোপাট করার জন্য হাতটাও কেমন যেন নিশপিশ করে। নাঃ, ওসব ছ্যাঁচড়ামির ফাঁদে পা দিতে মন সায়

দেয় না সনাতনের।

তালবেতাল ভাবতে ভাবতে আচমকাই সনাতন একটা উপায় ঠাওরেছে। কেন মরতে পড়ে থাকা এই শহরটায়? এখানে তো তিনকুলে তার কেউ নেই। কেটে পড়লেই তো হয়। কোথাও গিয়ে নতুন করে পুরোনো ধান্দায় নেমে পড়লে কে আটকাচ্ছে? তার শিল্পী হাত দুটো তো আছে। যেখানেই যাবে, করে খাবে। লাভের মধ্যে লাভ, অন্তত বজ্রবাহুর থাবায় আর পড়তে হবে না।

মতলবটা ভেঁজে নিয়ে সনাতন আহ্লাদে ডগমগ। সোজা বাসগুমটির দিকে চলেছে। পথে বাজারের সামনে থমকে দাঁড়াল। যদুময়রার দোকানে শিঙাড়া-জিলিপি ভাজা চলছে, ঘনশ্যামবাবুর রেস্টুরেন্টে চপ-কাটলেট। নানান সুখাদ্যের গন্ধে বাতাস ম ম। ওই সুবাসেই বুঝি সনাতনের খিদে চনচন করে উঠল। তা পকেটে টাকা যতক্ষণ আছে, ভাবনা কী? বুড়িমার হোটেলে ঢুকে দেদার মাংস-ভাত সাঁটাল সনাতন। পেট ভরতেই জড়িয়ে এল চোখ, বাসগুমটির সিমেন্টের বেঞ্চিতে গিয়ে লম্বা হয়েছে।

ঘুম ভাঙল সাঁঝবেলায়। তুড়ি মেরে হাই তুলতে তুলতে উঠে বসল সনাতন। ফুরফুরে বাতাস বইছে। ওই বাতাসেই বুঝি সনাতনের মন হঠাৎ উদাস। জন্মে ইস্তক এই শহরেই রয়েছে সে। এখানেই মা মরল, বাবা মরল, কত কষ্টেসৃষ্টে

সে হাতের কাজ শিখল...। দুম করে এখান থেকে পাততাড়ি গোটাবে? তাও আবার আজই? এক্ষুনি? আদৌ না গেলে কী হয়?

ওমনি বজ্রবাহুর গর্জন কানে আছড়ে পড়ল। এখানে থাকলে কাজকর্ম করতেই হবে এবং ধরা পড়লে কারাগারে যেতেই হবে। আর সেখানে গেলে তো এবার...।

সনাতন ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল। নাঃ, কেটে পড়াই শ্রেয়। তবে আজকের রাতটা থাক, কাল ভোরেই নয় রওনা দেবে। ব্যাজার মুখে সারাসন্ধে ঝুম হয়ে বসে রইল সনাতন। রাতে আর কিছু খেল না। চারদিক নিশুত হয়ে আসার পর উঠে পড়েছে। দেশত্যাগী হওয়ার আগে পুরোনো চেনা শহরটাকে শেষবারের মতো দেখে নেবে।

এ পাড়া ও পাড়ায় ঘুরল কিছুক্ষণ। নির্জন রাস্তায় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে কুকুরগুলো। শুনতে মন্দ লাগছিল না সনাতনের। ব্যাটারা বিদায়ীসঙ্গীত গাইছে যেন। মোটামুটি চক্কর মেরে সনাতন জেলখানার সামনে এসে দাঁড়াল। এই শহরে তার সবচেয়ে প্রিয় আস্তানা। আর এখানে আসা হবে না, ভাবলেই মনটা কষটে মেরে যায়।

জেলখানার পাশের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে শুরু করল সনাতন। ফাঁকা পথ। দু-ধারের বাতিগুলো ঠিকঠাক জ্বলছে না আজ। বেশ একটা আবছায়া দানা বেঁধেছে যেন। জেলখানাটা

পেরিয়ে সনাতনের পা আটকে গেল সহসা। পাশেই একটা একতলা বাড়ি। দরজায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। ভিতরে ঘুরঘুট্টি আঁধার। এই চৈত্র মাসেও সব ক'টা জানলা বন্ধ। নির্ঘাত কেউ নেই।

কথাটা মনে হতেই সনাতনের প্রাণ আনচান। যাওয়ার আগে শেষ একটা দাঁও মেরে যাবে নাকি?

তখনই পিছনে এক মোলায়েম গলা, 'এখানে কী উদ্দেশ্যে ভাই?'

ভীষণ চমকাল সনাতন। ঘুরে দেখল, একটা ঢ্যাঙা লোক তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। পুলিশও নয়, জেলখানার কোনও পেয়াদাও নয়, একদম অচেনা মুখ।

সনাতন ঢোক গিলে বললে, 'না, মানে এমনিই একটু ঘুরতে ঘুরতে...।'

'রাতদুপুরে বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ। মানে...না। মানে হ্যাঁ!' কী জবাব দেবে ঠিক ভেবে উঠতে পারছিল না সনাতন। জোর করে একটা তেরিয়া ভাব আনল গলায়, 'তাতে আপনার কী দরকার?'

'আছে, আছে। যদি তুমি চোর হও, তোমাকে আমার কাজে লাগবে।'

'মানে?'

'পকেটে চাবিটা নেই, তোমাকে দিয়ে তা হলে তালাটা

খুলিয়ে নিতাম।'

সনাতনের অস্বস্তি বুঝি কাটল খানিকটা। এই লোকটা তার মানে বাড়ির মালিক? কিন্তু হুট করে নিজেকে চোর বলে স্বীকার করে নেওয়া কি ঠিক হবে?

লোকটা এবার গাল ছড়িয়ে হাসছে, 'এত সংকোচ করছ কেন? নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, আমি চেঁচামেচি করব না। অবশ্য যদি নেহাতই ছিঁচকে চোর হও, তবে এই তালা খোলা তোমার কম্মো নয়। চুপচাপ সরে পড়তে পারো।'

ফস করে সনাতনের আঁতে লেগে গেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'দুর, দুর! এ তালা খোলা তো বাঁ হাত কা খেল!'

'তবে খেলাটি দেখাও। চক্ষু সার্থক করি!'

'একটা তারটার গোছের কিছু যদি থাকত।' সনাতন পকেট হাতড়াল, সরঞ্জাম তো কিছু কাছে নেই।

'স্ক্রু-ডাইভারে চলবে?'

'আছে নাকি?'

'থাকে সঙ্গে। যদি কারও কাজেকম্মে লাগে। '

ভারী মজার লোক তো! অন্যের জন্য স্ক্রু-ডাইভার পকেটে নিয়ে ঘোরে! সরু মুখওয়ালা যন্ত্রটা নিয়ে শিল্পকর্মে মন দিল সনাতন। খোঁচাখুচি করতে করতে চাপ দিল মাপমতো। ব্যাস, তালা হাঁ।

লোকটা সনাতনের পিঠে আলতো চাপড় কষাল, বেড়ে

ওস্তাদ তো। চলো, এবার বাড়ির ভিতরে তোমার কেরামতি দেখি।

দরজা ঠেলে অন্দরে পা রাখল সনাতন। লোকটা আলো জ্বালাল না, তাকাল ইতিউতি। তাতে অবশ্য সনাতনের অসুবিধে নেই। অন্ধকারে চোখ না চললে এতদিন এই লাইনে সে করেকম্মে খাচ্ছে কী করে?

লোকটা ভারিক্কি স্বরে জিগ্যেস করল, 'কী হে, ঘরদোর আন্দাজ করতে পারছ?'

'আজ্ঞে, পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওই তো পরপর দুটো দরজা, ওপাশে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর...।'

'বাঃ, বাঃ! আমাকেও হার মানিয়ে দিলে হে। আমিও তো এত নিখুঁত বলতে পারব না।'

'কেন লজ্জা দিচ্ছেন স্যার?' সনাতন গা মোচড়াল, যদি অনুমতি দেন তো আর-একটা খেলা দেখাতে পারি।'

'কীরকম?'

'বাড়িতে কোথায় কোথায় টাকাপয়সা রাখা আছে, বের করে দিতে পারি।'

'বলো কী হে? এমনটা পারা যায় নাকি?'

'আজ্ঞে, আমার গুরুদেব একটা মন্ত্র দিয়েছিলেন। সেটা জপ করে শুভ কাজে নামলে আপনাআপনি টাকাপয়সার বাস পাই।'

'তোমার গুরুদেবটি কে?'

'আমার বাবা। শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবন। তিনি মন্ত্রটি পেয়েছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে।'

'তোমার বংশটি তো বেশ সরেস। তা দেখাও দেখি তোমার ভোজবাজি। আলোটালোগুলো কি জ্বেলে দেব?'

'কিচ্ছু লাগবে না স্যার। আঁধারেই তো এই খেলাটা জমে।'

বলতে বলতে সামনের ঘরটায় ঢুকে পড়ল সনাতন। মনে মনে আওড়াল,

আঁধারং আঁধারং,
অর্থম অনর্থং।
হিং টিং ছট,
উলটে দেব ঘট।
ক্রিং ফুং টুম
কোথায় গেলি বাপ?
নিশিকুটুম্ব আহ্বানং
কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

ব্যাস, সনাতন পেয়ে গিয়েছে গন্ধ। মিশমিশে অন্ধকারেই টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করে আনল বেশ কয়েকখানা নোট। আলমারির মাথা থেকে নামিয়ে ফেলল খুচরো টাকায় বোঝাই টিনের কৌটো। বিছানার তলা থেকে পেয়ে গেল এককাঁড়ি সিকি-আধুলি। টুপ করে এক খাবলা পকেটস্থ করতে সাধ যাচ্ছিল, কোনওক্রমে সংবরণ করল লোভ। গৃহস্থের সামনেই

তাঁর ধন লোপাট করাটা সনাতনের ধর্মে বাধে। টাকাপয়সার সবটাই লোকটার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'খোলা জায়গায় মোটামুটি এই-ই আছে। বাকিটা আলমারিতে। ঠিক বলছি?

'তুমি তো ঠিক-বেঠিকের বাইরে চলে গিয়েছ হে! আমাকে মুহুর্মুহু চমকে দিচ্ছ। এবার হয়তো বলে বসবে গয়নাগাঁটির হদিসও তোমার অজানা নেই।'

'আজ্ঞে, সেটিও অনুমান করেছি বইকি। কোণের ওই বেঁটে সিন্দুকটায়...।'

'বিড়ালকেও তো তুমি হার মানালে। চাবি ছাড়া নিশ্চয়ই সিন্দুক খোলার মুরোদ হবে না?'

জবাব না দিয়ে, কাছে গিয়ে, সিন্দুকে আলগা হাত বোলাল সনাতন। লজ্জা লজ্জা মুখে বলল, 'কম্বিনেশন লক। যদি অনুমতি দেন তো চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'বেশ তো, পারলে খোলো।'

বড় গোল হাতলখানা কয়েক পাক ঘোরাল সনাতন। পাশের ছোট্ট হাতলটাকেও ঘুরপাক খাওয়াল। তারপর একবার বড়টাকে মোচড়ায়, একবার ছোটটাকে। কান নিয়ে গেল সিন্দুকের গায়ে। মিনিটপাঁচেক পর কট করে শব্দ। এবার চাপ দিয়ে একটা টান, খুলে গেল সিন্দুক।

সনাতনের হাসি আর ধরে না। দু-হাত ঝেড়ে বলল, 'পেরেছি স্যার।'

'গুড। ভেরি গুড।'

'এবার তা হলে আবার লাগিয়ে দিই?'

'আহা, থাক না। চলো, অন্যত্র যাই।'

'কোথায় স্যার?'

'তুমি এত খেলা দেখালে, এইবার আমি কী পারি তুমি দ্যাখো।'

কৌতূহলী সনাতন লোকটার পিছু পিছু বেরিয়ে এল। পাশের ঘরে ঢুকেছে। এখানে তেমন কিছু আছে বলে মনে হল না সনাতনের। শুধু একগাদা বই, টেবিল, চেয়ার, একখানা জাম্বো সাইজ টিভি, আর মোড়াটোড়া গোছের কিছু হাবিজাবি আসবাব। কেন এ ঘরে এল বোঝার আগে হঠাৎই লোকটা উধাও। বাইরে থেকে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। দৌড়ে গিয়ে টানল সনাতন, কিন্তু দরজা আর খুলল না।

সনাতন ব্যাজার মুখে চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা কেমন রসিকতা হল স্যার? আমি তো আপনাকে না জানিয়ে কিছু করিনি।

বাইরে থেকে খ্যাকখ্যাক হাসি উড়ে এল, 'এখন সারারাত ধরে বসে ভাবো, কোন খেলাটা বেশি জব্বর? তোমারটা? না আমারটা?

জোর ধন্দ জাগল সনাতনের। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'মানে?'

'আলো জ্বাললেই টেরটি পাবে।' লোকটার হাসি চওড়া হল,

'কিছু মনে কোরো না ভাই, টাকাকড়ি গয়নাগাঁটিগুলো আমার জিম্মায় রইল। গোটা রাত চেষ্টা করেও যা হয়তো আমি পারতাম না, মাত্র আধঘণ্টায় তুমি তা করে দেখিয়েছ। ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। চলি ভাই!'

সর্বনাশ, এ তো চোরের ওপর বাটপারি। গোমুখ্যুর মতো এই লোকটাকেই কিনা বাড়ির মালিক ভেবে নিয়েছিল সনাতন! কিন্তু এখন সে বেরোবে কী উপায়ে? দৃষ্টি যেন আর কাজ করছে না, সনাতন এখন করেটা কী?

হাতড়ে হাতড়ে সুইচবোর্ডের কাছে গিয়ে আলোটা জ্বালল সনাতন। টেবিলে চোখ পড়তেই রক্ত হিম। বাঁধানো ফোটোটা কার? এ যে বজ্রবাহু সাঁপুই!

সব্বোনাশ, শেষে কিনা সনাতন ফের বাঘেরই গুহায় বন্দি!

জন্ম ভাগলপুরে, ১০ জানুয়ারি, ১৯৫০। স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে দক্ষিণ কলকাতায়। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি গভীর টান বোধ করতেন। তবে লেখালেখিতে মনোযোগী হয়েছেন সত্তর দশকের শেষ থেকে। সুচিত্রার লেখাতে বারবারই ঘুরে-ফিরে আসে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের আত্মিক দিক, নানান জটিলতা। আবার ছোটদের জন্যে গোয়েন্দা কাহিনি থেকে হাসির গল্প সব পরিধিতেই সমান জনপ্রিয় তিনি। ইতিমধ্যেই নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সুচিত্রা। এইসব পুরস্কারের মধ্যে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী পদক, শরৎ সাহিত্য পুরস্কার, দ্বিজেন্দ্রলাল পুরস্কার, শৈলজানন্দ পুরস্কার, তারাশঙ্কর পুরস্কার, কথা পুরস্কার, সাহিত্যসেতু পুরস্কার প্রভৃতি।

প্রচ্ছদ **রোচিষ্ণু সান্যাল**